سُورَةُ الْفَاتِحَةِ

সূরা আল-ফাতিহা

এ সূরাটি মক্কী এবং এর আয়াত সংখ্যা সাত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য ঃ সূরা আল্-ফাতিহা কোরআনের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সূরা। প্রথমত এ সূরা দ্বারাই পবিত্র কোরআন আরম্ভ হয়েছে এবং এ সূরা দিয়েই সর্বশ্রেষ্ঠ এবাদত নামায আরম্ভ হয়। অবতরণের দিক দিয়েও পূর্ণাঙ্গ সূরারূপে এটিই প্রথম নাযিল হয়। সূরা 'ইক্‌রা', 'মুয্‌যাম্মিল' ও সূরা 'মুদ্দাস্‌সিরে'র ক'টি আয়াত অবশ্য সূরা আল-ফাতিহার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ সূরারূপে এ সূরার অবতরণই সর্বপ্রথম। যে সকল সাহাবী (রা) সূরা আল-ফাতিহা সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন, তাঁদের সে বক্তব্যের অর্থ বোধ হয় যে, পরিপূর্ণ সূরারূপে এর আগে আর কোন সূরা নাযিল হয়নি। এ জন্যই এই সূরার নাম 'ফাতিহাতুল-কিতাব' বা কোরআনের উপক্রমণিকা রাখা হয়েছে।

'সূরাতুল ফাতিহা' একদিক দিয়ে সমগ্র কোরআনের সার-সংক্ষেপ। এ সূরায় সমগ্র কোরআনের সারমর্ম সংক্ষিপ্তাকারে বলে দেওয়া হয়েছে। কোরআনের অবশিষ্ট সূরাগুলো প্রকারান্তরে সূরাতুল ফাতিহারই বিস্তৃত ব্যাখ্যা। কারণ, সমগ্র কোরআন প্রধানত ঈমান এবং নেক আমলের আলোচনাতেই কেন্দ্রীভূত। আর এ দু'টি মূলনীতিই এ সূরায় সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হয়েছে। তফসীরে রূহুল মা'আনী ও রুহুল বয়ানে এর বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। তাই এ সূরাকে সহীহ হাদীসে 'উম্মুল কোরআন' 'উম্মুল কিতাব', 'কোরআনে আযীম' বলেও অভিহিত করা হয়েছে। (কুরতুবী)

অথবা এ জন্য যে, যে ব্যক্তি কোরআন তেলাওয়াত বা অধ্যয়ন করবে তার জন্য এ মর্মে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সে যেন প্রথমে পূর্বপোষিত যাবতীয় ধ্যান-ধারণা অন্তর থেকে দূরীভূত করে একমাত্র সত্য ও সঠিক পথের সন্ধানের উদ্দেশ্যে এ কিতাব তেলাওয়াত আরম্ভ করে এবং আল্লাহ্‌র নিকট এ প্রার্থনাও করে যে, তিনি যেন তাকে সিরাতুল-মুস্তাকীমের হেদায়েত দান করেন।

এ সূরার প্রথমেই রয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা। এর অর্থ হচ্ছে যে, এ প্রশংসার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র দরবারে হেদায়েতের দরখাস্ত পেশ করা হলো। আর এ দরখাস্তের প্রত্যুত্তরই সমগ্র কোরআন, যা الٓمّٓ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ দ্বারা আরম্ভ হয়েছে। অর্থাৎ, মানুষ আল্লাহ্‌র নিকট সঠিক পথের যে সন্ধান চেয়েছে, আল্লাহ্ পাক তার প্রত্যুত্তরে الٓمّٓ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ বলে ইশারা করে দিলেন যে, হে আদম সন্তানগণ, তোমরা যা চাও তা এ গ্রন্থেই রয়েছে।

হযরত রাসূলে করীম (সা) এরশাদ করেছেন যে,—যাঁর হাতে আমার জীবন-মরণ, আমি তাঁর শপথ করে বলছি, সূরা আল-ফাতিহার দৃষ্টান্ত তওরাত, ইনজীল, যবুর প্রভৃতি অন্য কোন আসমানী কিতাবে তো নেই-ই, এমনকি পবিত্র কোরআনেও এর দ্বিতীয় নেই। ইমাম তিরমিযী আবূ হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন যে,—সূরায়ে-ফাতিহা প্রত্যেক রোগের ঔষধবিশেষ।

হাদীস শরীফে সূরা আল-ফাতিহাকে সূরায়ে শেফাও বলা হয়েছে। (কুরতুবী)

বোখারী শরীফে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) এরশাদ করেছেন,—সমগ্র কোরআনে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সূরা হচ্ছে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ —(কুরতুবী)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

بِسْمِ اللّٰهِ কোরআনের একটি আয়াত ঃ সমস্ত মুসলমান এতে একমত যে, بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ কোরআন শরীফের সূরা নাম্‌লের একটি আয়াত বা অংশ এবং এ ব্যাপারেও একমত যে, সূরা তওবা ব্যতীত প্রত্যেক সূরার প্রথমে ... بِسْمِ اللّٰهِ লেখা হয়। بِسْمِ اللّٰهِ সূরা আল-ফাতিহার অংশ না অন্যান্য সকল সূরারই অংশ, এতে ইমামগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেছেন بِسْمِ اللّٰهِ সূরা নাম্‌ল ব্যতীত অন্য কোন সূরার

অংশ নয়। তবে এটি এমন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আয়াত যা প্রত্যেক সূরার প্রথমে লেখা এবং দু'টি সূরার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করার জন্য এটি অবতীর্ণ হয়েছে।

কোরআন তেলাওয়াত ও প্রত্যেক কাজ বিসমিল্লাহ্‌সহ আরম্ভ করার আদেশঃ জাহেলিয়াত যুগে লোকদের অভ্যাস ছিল, তারা তাদের প্রত্যেক কাজ উপাস্য দেব-দেবীদের নামে শুরু করতো। এ প্রথা রহিত করার জন্য হযরত জিবরাঈল পবিত্র কোরআনের সর্বপ্রথম যে আয়াত নিয়ে এসেছিলেন, তাতে আল্লাহ্‌র নামে কোরআন তেলাওয়াত আরম্ভ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। যথা اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ

আল্লামা সুয়ূতী (র) বলেছেন যে, শুধু কোরআনই নয়, বরং অন্যান্য আসমানী কিতাবও বিসমিল্লাহ্ দ্বারা আরম্ভ করা হয়েছিল। কোন কোন আলেম বলেছেন যে, বিসমিল্লাহ্ পবিত্র কোরআন ও উম্মতে মুহাম্মদীর বিশেষত্ব। উল্লেখিত দু'টি মতের মীমাংসা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার নামে আরম্ভ করার আদেশ সকল আসমানী কিতাবের জন্যই বিদ্যমান ছিল। তবে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এর শব্দগুলো কোরআনের বিশেষত্ব। যেমন, কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায়, স্বয়ং রাসূল করীম (সা)-ও প্রথমে প্রত্যেক কাজ بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ বলে আরম্ভ করতেন এবং কোন কিছু লেখাতে হলেও এ কথা প্রথমে লেখাতেন। কিন্তু بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ অবতীর্ণ হওয়ার পর এ বর্ণগুলোকেই গ্রহণ করা হলো এবং সর্বকালের জন্য বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম বলে সব কাজ শুরু করার নিয়ম প্রবর্তিত হলো। (কুরতুবী, রূহুল মা'আনী)

কোরআন শরীফের স্থানে স্থানে উপদেশ রয়েছে যে, প্রত্যেক কাজ বিসমিল্লাহ বলে আরম্ভ কর। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন যে, "যে কাজ বিসমিল্লাহ্ ব্যতীত আরম্ভ করা হয়, তাতে কোন বরকত থাকে না।"

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে, ঘরের দরজা বন্ধ করতে বিসমিল্লাহ্ বলবে, বাতি নেভাতেও বিসমিল্লাহ্ বলবে, পাত্র আবৃত করতেও বিসমিল্লাহ্ বলবে। কোন কিছু খেতে, পানি পান করতে, ওযু করতে, সওয়ারীতে আরোহণ করতে এবং তা থেকে অবতরণকালেও বিসমিল্লাহ্ বলার নির্দেশ কোরআন-হাদীসে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। (কুরতুবী)

প্রত্যেক কাজে বিস্‌মিল্লাহ্ বলার রহস্য ঃ ইসলাম প্রত্যেক কাজ বিসমিল্লাহ্ বলে শুরু করার নির্দেশ দিয়ে মানুষের গোটা জীবনের গতিই অন্য সকল কিছুর দিক থেকে সরিয়ে নিয়ে একমাত্র আল্লাহ্‌র দিকে ফিরিয়ে দিয়েছে। বারবার আল্লাহ্‌র নামে কাজ শুরু করার মাধ্যমে সে প্রতি মুহূর্তেই আনুগত্যের এ স্বীকারোক্তি নবায়ন করে যে, আমার অস্তিত্ব ও আমার যাবতীয় কাজ-কর্ম আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও সাহায্য ছাড়া হতে পারে না। এ নিয়তের ফলে তার ওঠাবসা, চলাফেরাসহ পার্থিব জীবনের সকল কাজকর্ম এবাদতে পরিণত হয়ে যায়।

কাজটা কতই না সহজ! এতে সময়ের অপচয় হয় না, পরিশ্রমও হয় না, কিন্তু উপকারিতা একান্তই সুদূরপ্রসারী। এতে দুনিয়াদারীর প্রতিটি কাজ দ্বীনের কাজে রূপান্তরিত হয়ে যায়। মুসলমান-অমুসলমান নির্বিশেষে সকলেই পানাহার করে, কিন্তু মুসলমান আহার গ্রহণের পূর্বে বিসমিল্লাহ্ বলে এ স্বীকারোক্তি জানায় যে, আহার্য-বস্তু যমীনে উৎপন্ন হওয়া থেকে শুরু করে পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত তাতে কত পরিশ্রমই না নিয়োজিত হয়েছে। আকাশ-বাতাস, গ্রহ-নক্ষত্রের কত অবদানেই না এক-একটি শস্যদানার দেহ পুষ্টিলাভ করেছে। মানুষ, প্রকৃতি এবং উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত অন্যান্য জীব-জানোয়ারের যে অবদান খাদ্যের প্রতিটি কণায় বিদ্যমান, তা আমার শ্রম বা চেষ্টা দ্বারা সম্ভবপর ছিল না। একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই অনুগ্রহ করে এগুলোকে বিবর্তনের সকল স্তর অতিক্রম করিয়ে উপাদেয় আহার্যরূপে আমাকে দান করেছেন।

মুসলমান-অমুসলমান সকলেই শোয়, ঘুমায়, আবার জেগে ওঠে। কিন্তু মুমিন তার শোয়ার এবং জেগে ওঠার সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে আল্লাহ্‌র সাথে তার যোগাযোগের সম্পর্ক নবায়ন করে। ফলে তার জাগতিক কাজকর্মও আল্লাহ্‌র যিকিরে রূপান্তরিত হয়ে বন্দেগীরূপে লিখিত হয়। একজন মুমিন কোন যানবাহনে আরোহণকালে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ ক'রে এ কথারই সাক্ষ্য দেয় যে, এ যান-বাহনের সৃষ্টি এবং আমার ব্যবহারে এনে দেওয়া ছিল মানবীয় ক্ষমতার ঊর্ধ্বে। একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই সুষ্ঠু এক পরিচালনা পদ্ধতির বদৌলতে কোথাকার কাঠ, কোথাকার লোহা, কোথাকার কারিগর, কোথাকার চালক সবকিছু সমবেত করে সবগুলোকে মিলিয়ে আমার খেদমতে নিয়োজিত করেছেন। সামান্য কয়টি পয়সা ব্যয় করে আল্লাহ্‌র এতবড় সৃষ্টি আমার নিজের কাজে ব্যবহার করতে পারছি এবং সে পয়সাও আমি নিজে কোন জায়গা হতে সঙ্গে নিয়ে আসিনি; বরং তা সংগ্রহ করার সকল ব্যবস্থাও তিনিই করে দিয়েছেন। চিন্তা করুন, ইসলামের এ সামান্য শিক্ষা

মানুষকে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে দিয়েছে। এজন্য এরূপ বলা যথার্থ যে, বিসমিল্লাহ্ এমন এক পরশপাথর যা শুধু তামাকে নয়, বরং মাটিকেও স্বর্ণে পরিণত করে।

فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ عَلٰى دِيْنِ الْاِسْلَامِ وَتَعْلِيْمَاتِهٖ-

মাসআলা ঃ কোরআন তেলাওয়াত শুরু করার আগে প্রথমে اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ এবং পরে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পাঠ করা সুন্নত। তেলাওয়াতের মধ্যেও সূরা তওবা ব্যতীত সকল সূরার প্রথমে বিসমিল্লাহ্ পাঠ করা সুন্নত।

বিসমিল্লাহ্র তফসীর

বিসমিল্লাহ্ বাক্যটি তিনটি শব্দ দ্বারা গঠিত। প্রথমত 'বা' বর্ণ, দ্বিতীয়ত 'ইসম' ও তৃতীয়ত 'আল্লাহ্'। আরবী ভাষায় 'বা' বর্ণটি অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তন্মধ্যে তিনটি অর্থ এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে এবং এ তিনটির যে কোন একটি অর্থ এক্ষেত্রে গ্রহণ করা যেতে পারে। এক—সংযোজন। অর্থাৎ এক বস্তুকে অপর বস্তুর সাথে মিলানো বা সংযোগ ঘটানো অর্থে। দুই—এস্তেয়ানাত—অর্থাৎ কোন বস্তুর সাহায্য নেওয়া। তিন—কোন বস্তু থেকে বরকত হাসিল করা।

ইসম শব্দের ব্যাখ্যা অত্যন্ত ব্যাপক। মোটামুটিভাবে এতটুকু জেনে রাখা যথেষ্ট যে, 'ইসম' নামকে বলা হয়। 'আল্লাহ্' শব্দ সৃষ্টিকর্তার নামসমূহের মধ্যে সবচেয়ে মহত্তর ও তাঁর যাবতীয় গুণের সম্মিলিত রূপ। কোন কোন আলেম একে ইসমে-আ'যম বলেও অভিহিত করেছেন।

এ নামটি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো জন্য প্রযোজ্য নয়। এজন্যই এ শব্দটির দ্বিবচন বা বহুবচন হয় না। কেননা, আল্লাহ্ এক ; তাঁর কোন শরীক নেই। মোটকথা, আল্লাহ্ এমন এক সত্তার নাম, যে সত্তা পালনকর্তার সমস্ত গুণের এক অসাধারণ প্রকাশবাচক। তিনি অদ্বিতীয় ও নজীরবিহীন। এজন্য বিসমিল্লাহ্ শব্দের মধ্যে 'বা'-এর তিনটি অর্থের সামঞ্জস্য হচ্ছে আল্লাহ্র নামের সাথে, তাঁর নামের সাহায্যে এবং তাঁর নামের বরকতে।

কিন্তু তিন অবস্থাতেই যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর নামের সাথে, তাঁর নামের সাহায্যে এবং তাঁর নামের বরকতে, যে কাজ করা উদ্দেশ্য তা উল্লেখ করা না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত বাক্যটি অসম্পূর্ণ থাকে। এজন্য 'ইলমে নাহবের' (আরবী ব্যাকরণশাস্ত্র) নিয়মানুযায়ী স্থান-উপযোগী ক্রিয়া উহ্য ধরে নিতে হয়। যথা, 'আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করছি

বা পড়ছি।' এ ক্রিয়াটিকে উহ্যই ধরতে হবে, যাতে 'আরম্ভ আল্লাহ্‌র নামে' কথাটি প্রকাশিত হয়। সে উহ্য বিষয়টিও আল্লাহ্‌র নামের পূর্বে হবে না। আরবী ভাষার নিয়মানুযায়ী শুধু 'বা' বর্ণটি আল্লাহ্‌র নামের পূর্বে ব্যবহৃত হয়েছে। এ ব্যাপারে মাসহাফে-উসমানীতে সাহাবীগণের সম্মিলিত অভিমত উদ্ধৃত করে মন্তব্য করা হয়েছে যে, 'বা' বর্ণটি 'আলিফ'-এর সঙ্গে মিলিয়ে এবং 'ইসম' শব্দটি পৃথকভাবে লেখা উচিত ছিল। এমতাবস্থায় শব্দের রূপ হতো بِاسْمِ اللّٰهِ কিন্তু মাসহাফে-উসমানীর লিখন-পদ্ধতিতে 'হামযা' বর্ণটি উহ্য রেখে 'বা'-কে 'সীন'-এর সাথে যুক্ত করে লিখে 'বা'-কে ইসমের অংশ করে দেওয়া হয়েছে, যাতে আরম্ভটা 'আল্লাহ্‌র নামে'ই হয়। একই কারণে অন্যত্র আলিফকে উহ্য রাখা হয় না। যথা اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ এতে 'বা'-কে 'আলিফের' সাথে লেখা হয়েছে। মোটকথা, বিসমিল্লাহ্‌র বেলায় বিশেষ এক পদ্ধতি অনুসরণ করেই 'বা' বর্ণকে 'ইসম'-এর সঙ্গে মিলিত করে লেখার নিয়ম নির্ধারণ করা হয়েছে। اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ রাহমান ও রাহীম উভয়ই আল্লাহ্‌র গুণবাচক নাম। রহমান অর্থ সাধারণ ও ব্যাপক রহমত এবং রাহীম অর্থ পরিপূর্ণ ও বিশেষ রহমত।

সাধারণ রহমতের অর্থ হচ্ছে যে, এ রহমত বা দয়া সমগ্র জাহানে যা সৃষ্টি হয়েছে এবং ভবিষ্যতে যা সৃষ্টি হবে, সে সকলের জন্যই সমভাবে প্রযোজ্য। পরিপূর্ণ রহমত অর্থ হচ্ছে যে, তা সম্পূর্ণ বা পূর্ণাঙ্গ। আর এ জন্যই 'রহমান' শব্দ আল্লাহ্ তা'আলার 'যাতের' জন্য নির্দিষ্ট। কোন সৃষ্টিকে রহমান বলা চলে না। কারণ আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কোন সত্তা নেই, যার রহমত বা দয়া সমস্ত বিশ্ব-চরাচরে সমভাবে বিস্তৃত হতে পারে। এজন্য 'আল্লাহ্' শব্দের ন্যায় 'রহমান' শব্দেরও দ্বি-বচন বা বহু-বচন হয় না। কেননা, এ শব্দটি একক সত্তার সাথে সংযুক্ত বা একক সত্তার জন্য নির্দিষ্ট। তাই এখানে দ্বিতীয় বা তৃতীয় কারো উপস্থিতির সম্ভাবনা নেই। (কুরতুবী)

'রাহীম' শব্দের অর্থ 'রহমান' শব্দের অর্থ থেকে স্বতন্ত্র। কারণ, কোন ব্যক্তির পক্ষে অন্য ব্যক্তির প্রতি দয়া প্রদর্শন করা সম্ভব, সুতরাং সে দয়া বা রহমত এ শব্দে প্রযোজ্য হওয়া অসম্ভব নয়। এ জন্য 'রাহীম' শব্দ মানুষের জন্যও বলা যেতে পারে। আল-কোরআনে রাসূল (সা)-এর জন্যও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। বলা হয়েছে—

بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُفٌ رَّحِيْمٌ

মাসআলা ঃ আজকাল 'আবদুর রহমান', 'ফজলুর রহমান' প্রভৃতি নাম সংক্ষেপ করে শুধু 'রহমান' বলা হয়ে থাকে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে 'রহমান' বলে ডাকা হয়। এরূপ সংক্ষেপ করা জায়েয নয়; পাপের কাজ।

জ্ঞাতব্য ঃ বিসমিল্লাহ্তে আল্লাহ্ তা'আলার সুন্দর নাম ও পূর্ণাঙ্গ গুণাবলীর মধ্যে মাত্র দু'টি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। শব্দ দু'টিই 'রহমত' শব্দ হতে গঠিত হয়েছে, যা রহমতের ব্যাপকতার প্রতি ইশারা করে। এতে একথাও বোঝানো হয়েছে যে, এ বিশ্ব-চরাচর, আকাশ, বাতাস, সৃষ্টিরাজি পয়দা করা, এ সবের রক্ষণাবেক্ষণ ও লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করাও আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলীতে সংযুক্ত। কোন বস্তুকেই তিনি স্বীয় প্রয়োজনে বা অন্য কারো প্ররোচনায় বা অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সৃষ্টি করেন নি। বরং তাঁর রহমত বা দয়ার তাকিদেই সৃষ্টি করে এর রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রতিপালনের ব্যবস্থা করেছেন।

'তাআব্বুজ' শব্দের অর্থ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ পাঠ করা।

আল-কোরআনে এরশাদ হয়েছে—যখন কোরআন পাঠ কর, তখন শয়তানের প্রতারণা হতে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় চাও। দ্বিতীয়ত, কোরআন পাঠের প্রাক্কালে আ'ঊযুবিল্লাহ্ পাঠ করা ইজমায়ে-উম্মত দ্বারা সুন্নত বলে স্বীকৃত হয়েছে। এ পাঠ নামাযের মধ্যেই হোক বা নামাযের বাইরেই হোক। কোরআন তেলাওয়াত ব্যতীত অন্যান্য কাজে শুধু বিসমিল্লাহ্ পাঠ করা সুন্নত, আ'ঊযুবিল্লাহ্ নয়। যখন কোরআন তেলাওয়াত আরম্ভ করা হয়, তখন আ'ঊযুবিল্লাহ্ ও বিসমিল্লাহ্ উভয়টিই পাঠ করা সুন্নত। তেলাওয়াতকালে একটি সূরা শেষ করে অপর সূরা আরম্ভ করার পূর্বে শুধুমাত্র সূরা তওবা ব্যতীত অন্য সব সূরা তেলাওয়াতের আগে বিসমিল্লাহ্ পাঠ করতে হয়। তেলাওয়াত করার সময় মধ্যে সূরা-বারাআত এলে তখন বিসমিল্লাহ্ পড়া নিষেধ। কিন্তু প্রথম তেলাওয়াতই যদি সূরা বারাআত দ্বারা আরম্ভ হয়, তবে আ'ঊযুবিল্লাহ্ ও বিসমিল্লাহ্ উভয়টিই পাঠ করতে হবে। (আলমগিরী)

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম', কোরআনের সূরা নাম্‌ল-এর একটি আয়াতের অংশ এবং দু'টি সূরার মাঝখানে একটি পূর্ণাঙ্গ আয়াত। তাই অন্যান্য আয়াতের ন্যায় এ আয়াতটির সম্মান করাও ওয়াজিব। অযু ছাড়া উহাকে স্পর্শ করা জায়েয নয়। অপবিত্র অবস্থায় যথা হায়েয-নেফাসের সময় (পবিত্র হওয়ার পূর্বে) তেলাওয়াতরূপে পাঠ করাও না-জায়েয। তবে কোন কাজকর্ম আরম্ভ করার পূর্বে (যথা—পানাহার) দোয়াস্বরূপ পাঠ করা সব সময়ই জায়েয।

মাসআলা ঃ নামাযের প্রথম রাক'আত আরম্ভ করার সময় আ'উযুবিল্লাহ্-এর পরে বিসমিল্লাহ্ পাঠ করা সুন্নত। তবে আস্তে পাঠ করবে, না সরবে পাঠ করবে, এতে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা যায়। ইমাম আবু হানীফা (র) ও তাঁর অনুসারী ইমামগণ নীরবে পাঠ করাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। নামাযের প্রথম রাক'আতের পর অন্যান্য রাক'আতে বিসমিল্লাহ্ পাঠ করা সুন্নত বলে সকলে একমত হয়েছেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে প্রত্যেক রাক'আতের শুরুতে বিসমিল্লাহ্ পড়াকে ওয়াজিব বলা হয়েছে। (শরহে-মানিয়্যাহ্)

মাসআলা ঃ নামাযে সূরা-ফাতিহা পাঠ করার পর অন্য সূরা পাঠ করার পূর্বে বিসমিল্লাহ্ পাঠ না করা উচিত। নবী করীম (সা) এবং খোলাফায়ে রাশেদীন থেকে ইহা পাঠ করার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। 'শরহে মানিয়্যাতে' একে ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর অভিমত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শরহে-মানিয়্যাত, দুররে-মুখতার, বুরহান প্রভৃতি কিতাবে এ অভিমতকেই গ্রহণযোগ্য বলে মত প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেছেন, যেসব নামাযে নীরবে ক্বেরাআত পড়া হয়, সেসব নামাযে বিসমিল্লাহ্ পড়া উত্তম। আবার কোন কোন বর্ণনাতে ইহা ইমাম আবু হানীফা (র)-র মত বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। শামী কোন কোন ফেকাহ্শাস্ত্রবিদের মতামত বর্ণনা করে এ মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তবে এতেও সকলেই একমত হয়েছেন যে, যদি কেউ তা পাঠ করে তবে তাতেও কোন দোষের কারণ নেই।

سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝
مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ
نَسْتَعِيْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ
الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

১. যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। ২. যিনি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু। ৩. যিনি বিচার-দিনের মালিক। ৪. আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। ৫. আমাদেরকে সরল পথ দেখাও ; ৬. সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। ৭. তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার যিনি সকল

সৃষ্টিজগতের পালনকর্তা। (সৃষ্টির প্রতিটি প্রকারকেই এক একটি 'আলম' বা জগতরূপে গণ্য করা হয়। যথা—ফেরেশতা জগত, মানব-জগত, জ্বিন-জগত।)

اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ যিনি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু। مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ যিনি বিচার ও প্রতিদান-দিবসের মালিক। (কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার আমলের প্রতিদান দেওয়া হবে।) اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

আমরা তোমারই এবাদত করি আর তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। اِهْدِنَا

الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ আমাদিগকে সরল পথ দেখাও। صِرَاطَ الَّذِيْنَ

اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ—সে সমস্ত লোকের পথ, যাহাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ।

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ যাদের উপর তোমার গযব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট তাদের পথ নয়।

হেদায়তের পথ ত্যাগ করার দু'টি পন্থা। এক এই যে, পথের পুরোপুরি খোঁজ-খবর নেয়নি— ضَآلِّيْنَ শব্দে তাই বোঝানো হয়েছে। দ্বিতীয়ত পুরোপুরি খোঁজ-খবর নেওয়ার পর এবং তা সঠিক প্রমাণিত হওয়ার পরও উহাতে আমল করেনি। مَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ দ্বারা ঐ সমস্ত লোককে বোঝানো হয়েছে। কেননা, জেনে-শুনে যারা কাজ করে না, তাদের আচরণ অসন্তুষ্টির কারণ হওয়াই স্বাভাবিক।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরাতুল-ফাতিহার বিষয়বস্তু ঃ সূরাতুল-ফাতিহার আয়াত সংখ্যা সাত। প্রথম তিনটি আয়াতে আল্লাহ্‌র প্রশংসা এবং শেষের তিনটি আয়াতের মানুষের পক্ষ হতে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা ও দরখাস্তের বিষয়বস্তু, যা আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই দয়াপরবশ হয়ে মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন। মধ্যের একটি আয়াত প্রশংসা ও দোয়া-মিশ্রিত বিষয়বস্তুর সংমিশ্রণ।

মুসলিম শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সা) এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন—নামায (অর্থাৎ সূরাতুল-ফাতিহা) আমার এবং আমার বান্দাদের মধ্যে দু'ভাগে বিভক্ত; অর্ধেক আমার

জন্য আর অর্ধেক আমার বান্দাদের জন্য। আমার বান্দাগণ যা চায়, তা তাদেরকে দেওয়া হবে। অতঃপর রাসূল (সা) বলেছেন যে, যখন বান্দাগণ বলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ তখন আল্লাহ্ বলেন যে, আমার বান্দাগণ আমার প্রশংসা করছে। আর যখন বলে

اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ তখন তিনি বলেন যে, তারা আমার মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করছে। আর যখন বলে مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ তখন তিনি বলেন যে, আমার বান্দাগণ আমার গুণগান করছে। আর যখন বলে اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ তখন তিনি বলেন যে, এ আয়াতটি আমি এবং আমার বান্দাগণের মধ্যে সংযুক্ত। কেননা; এর এক অংশে আমার প্রশংসা এবং অপর অংশে বান্দাগণের দোয়া ও আরয হয়েছে। এ সঙ্গে এ কথাও বলা হয়েছে যে, বান্দাগণ যা চাইবে তারা তা পাবে।

অতঃপর বান্দাগণ যখন বলে اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ (শেষ পর্যন্ত) তখন আল্লাহ্ বলেন, এইসবই আমার বান্দাগণের জন্য এবং তারা যা চাইবে তা পাবে। (মাযহারী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার। অর্থাৎ দুনিয়াতে যে কোন স্থানে যে কোন বস্তুর প্রশংসা করা হয়, বাস্তবে তা আল্লাহ্রই প্রশংসা। কেননা, এ বিশ্ব চরাচরে অসংখ্য মনোরম দৃশ্যাবলী, অসংখ্য মনোমুগ্ধকর সৃষ্টিরাজি আর সীমাহীন উপকারী বস্তুসমূহ সর্বদাই মানব মনকে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আকৃষ্ট করতে থাকে এবং তাঁর প্রশংসায় উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, সকল বস্তুর অন্তরালেই এক অদৃশ্য সত্তার নিপুণ হাত সদা সক্রিয় রয়েছে।

যখন পৃথিবীর কোথাও কোন বস্তুর প্রশংসা করা হয়, তখন প্রকৃতপক্ষে তা উক্ত বস্তুর সৃষ্টিকর্তার প্রতিই গিয়ে বর্তায়। যেমন কোন চিত্র, কোন ছবি বা নির্মিত বস্তুর প্রশংসা করা হলে প্রকৃতপক্ষে সে প্রশংসা প্রস্তুতকারকেরই করা হয়।

এ বাক্যটি প্রকৃতপক্ষে মানুষের সামনে বাস্তবতার একটি নতুন দ্বার উন্মুক্ত করে দেখিয়ে দিয়েছে যে, আমাদের সামনে যা কিছু রয়েছে এ সব কিছুই একটি একক সত্তার সাথে জড়িত এবং সকল প্রশংসাই সে অনন্ত অসীম শক্তির। এ সব দেখে কারো অন্তরে

যদি প্রশংসাবাণীর উদ্রেক হয় এবং মনে করে যে, তা অন্য কারো প্রাপ্য, তবে এ ধারণা জ্ঞান-বুদ্ধির সংকীর্ণতারই পরিচায়ক। সুতরাং নিঃসন্দেহে একথাই বলতে হয় যে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ যদিও প্রশংসার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু এর মধ্যে অতি সূক্ষ্মতার সাথে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সকল সৃষ্ট বস্তুর উপাসনা রহিত করা হলো। তাছাড়া এর দ্বারা অত্যন্ত আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে একত্ববাদের শিক্ষাও দেওয়া হয়েছে। আল-কোরআনের এ ক্ষুদ্র বাক্যটিতে একদিকে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করা হয়েছে এবং অপরদিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে নিমগ্ন মানব মনকে এক অতিবাস্তবের দিকে আকৃষ্ট করত যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর পূজা-অর্চনাকে চিরতরে রহিত করা হয়েছে। এতদসঙ্গে অতি হেকমতের সাথে বা অকাট্যভাবে ঈমানের সর্বপ্রথম স্তম্ভ 'তওহীদ' বা একত্ববাদের পরিপূর্ণ নকশাও তুলে ধরা হয়েছে। একটু চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, বাক্যটিতে যে দাবী করা হয়েছে, সে দাবীর স্বপক্ষে দলীলও দেওয়া হয়েছে। فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ এ ক্ষুদ্র বাক্যটির পরেই আল্লাহ্ তা'আলার প্রথম গুণবাচক নাম "রাব্বুল আলামীন'-এর উল্লেখ করা হয়েছে। সংক্ষিপ্তভাবে এর তফসীর লক্ষণীয়।

আরবী ভাষায় رَبّ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে পালনকর্তা। লালন-পালন বলতে বোঝায়, কোন বস্তুকে তার সমস্ত মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রেখে ধীরে ধীরে বা পর্যায়ক্রমে সামনে অগ্রসর করে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দেওয়া।

এ শব্দটি একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই নির্দিষ্ট। সম্বন্ধপদ রূপে অন্যের জন্যেও ব্যবহার করা চলে, সাধারণভাবে নয়। কেননা, প্রত্যেকটি প্রাণী বা সৃষ্টিই প্রতিপালিত হওয়ার মুখাপেক্ষী, তাই সে অন্যের প্রকৃত প্রতিপালনের দায়িত্ব নিতে পারে না।

اَلْعٰلَمِيْنَ শব্দটি عَالَم শব্দের বহুবচন। এতে পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টিই অন্তর্ভুক্ত। যথা—আকাশ-বাতাস, চন্দ্র-সূর্য, তারা-নক্ষত্ররাজি, বিজলী, বৃষ্টি, ফেরেশতাকুল, জ্বিন, যমীন এবং এতে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে। জীবজন্তু, মানুষ, উদ্ভিদ, জড়-পদার্থ সব কিছুই এর অন্তর্ভুক্ত। অতএব رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -এর অর্থ হচ্ছে—আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টির পালনকর্তা। তাছাড়া একথাও চিন্তার উর্ধ্বে নয় যে, আমরা যে দুনিয়াতে বসবাস করছি এর মধ্যেও কোটি কোটি সৃষ্ট বস্তু রয়েছে। এ সৃষ্টিগুলোর মধ্যে

যা কিছু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় এবং যা আমরা দেখি না সে সবগুলোই এক একটা আলম বা জগত।

তাছাড়া আরো কোটি কোটি সৃষ্টি রয়েছে, যা সৌরজগতের বাইরে, যা আমরা অবলোকন করতে পারি না। ইমাম রাযী তফসীরে-কবীরে লিখেছেন যে, এ সৌরজগতের বাইরে আরো সীমাহীন জগত রয়েছে। যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত এবং একথা সর্বজনবিদিত যে, সকল বস্তুই আল্লাহ্র ক্ষমতার অধীন। সুতরাং তাঁর জন্য সৌরজগতের অনুরূপ আরো সীমাহীন কতকগুলো জগত সৃষ্টি করে রাখা অসম্ভব মোটেই নয়।

হযরত আবু সা'ঈদ খুদ্রী (রা) বলেছেন যে, চল্লিশ হাজার জগত রয়েছে। আর এ পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম ও উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত একটি জগত। বাকী-গুলির প্রত্যেকটিও অনুরূপ। হযরত মাকাতিল (রা) থেকেও বর্ণিত হয়েছে যে, জগতের সংখ্যা ৮০ হাজার। (কুরতুবী) এতে সন্দেহ করা হয় যে, মহাশূন্যে বায়ু না থাকায় মানুষ বা কোন প্রাণীর বাস করার উপযোগী নয় বলে কোন প্রাণী সেখানে জীবিত থাকতে পারে না। ইমাম রাযী এর উত্তরে বলেছেন যে, এটা এমন কোন জরুরী ব্যাপার নয় যে, এই জগতের বাইরে মহাশূন্যে যে অন্যান্য জগত রয়েছে, সেসব জগতের অধিবাসীদের প্রকৃতি ও অভ্যাস এই জগতের অধিবাসীদের মতই হতে হবে, যে জন্য তারা মহাশূন্যে জীবিত থাকতে পারবে না। বরং এরকমই বা হবে না কেন যে, সেসব জগতের অধিবাসীদের অভ্যাস ও প্রকৃতি এই জগতের অধি-বাসীদের অভ্যাস ও প্রকৃতি হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ?

আজ থেকে প্রায় সাতশ সত্তর বছর আগে যখন মহাশূন্য ভ্রমণের উপকরণও আবিষ্কৃত হয়নি, সে যুগেই মুসলিম দার্শনিক ইমাম রাযী এসব তথ্য লিখেছেন। আজকাল রকেট প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক যানের যুগে মহাশূন্য ভ্রমণকারিরা যা কিছু বলেন, তা ইমাম রাযীর বর্ণনার চেয়ে বেশী কিছু নয়।

এ জগতের বাইরে মহাশূন্যের কোন সীমা-পরিসীমা মানুষের জানা নেই। অতএব, নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন যে, সীমাহীন মহাশূন্যে আর কত সৃষ্টি রয়েছে। এই দুনিয়ার নিকটতম গ্রহ-উপগ্রহ চন্দ্র ইত্যাদির বাসিন্দা সম্পর্কে বর্তমান যুগের বিজ্ঞ বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, তাও তো এই যে, এ সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহে যদি কোন প্রাণী-জগতের অস্তিত্ব থেকেও থাকে, তবে তাদের স্বভাব-চরিত্র এ দুনিয়ার বাসিন্দাদের অনুরূপ হতে হবে, এমন কোন কথা নেই। বরং গ্রহণযোগ্য যুক্তি হচ্ছে এই যে, তাদের স্বভাব-চরিত্র, আদত-অভ্যাস, আহার্য ও প্রয়োজন এখানকার বাসিন্দাগণ হতে

সম্পূর্ণ পৃথক ও ভিন্ন হবে। এ জন্য একটিকে অপরটির উপর কিয়াস করার কোন কারণ থাকতে পারে না। ইমাম রাযীর এই উক্তির সমর্থনে, আমেরিকার মহাশূন্য ভ্রমণকারী জনৈক বিজ্ঞানী আকাশ ভ্রমণ হতে প্রত্যাবর্তন করে মহাশূন্য সম্পর্কে কিছুটা অনুমান ব্যক্ত করেছেন এবং বলেছেন যে, মহাশূন্যের সীমারেখা সম্পর্কে কোন কিছুই বলার উপায় নেই। মহাশূন্যের আয়তন ও সীমারেখা কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, তা অনুমান করাও কঠিন ব্যাপার।

আল-কোরআনের এ ছোট বাক্যটির প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিজগতের লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কত সুদৃঢ় ও কত অচিন্ত্যনীয় ব্যবস্থা করে রেখেছেন ! আকাশ থেকে পাতাল পর্যন্ত এবং গ্রহ থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধূলিকণা পর্যন্ত এই ব্যবস্থাপনার আওতাভুক্ত এবং একজন অতি প্রাজ্ঞ পরিচালকের অধীনে প্রতিটি সৃষ্ট বস্তুই নিজ নিজ কর্তব্যে নিয়োজিত। মানুষের সামান্য খাদ্য, যা সে তার মুখে দেয় তাতে চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, এর উৎপাদনের জন্য আকাশ ও যমীনের সমস্ত শক্তি এবং কোটি কোটি মানুষ ও জীব-জন্তুর পরিশ্রম তাতে শামিল রয়েছে। সমগ্র জগতের শক্তি এই এক লোকমা খাদ্য প্রস্তুতে এমনি ভাবে ব্যস্ত যে, মানুষ এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করেই তা দ্বারা যেন পরম জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয় ! সে যেন অনুধাবন করতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ ও যমীনের সকল সৃষ্টিকে মানবের উপকারের জন্য নিয়োজিত রেখেছেন। যার সেবায় এত কিছু নিয়োজিত, তার জন্ম অনর্থক নয়; বরং তারও কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য অবশ্যই রয়েছে।

আল-কোরআনের এ আয়াতটিতে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও মানব জীবনের মকসুদ বা লক্ষ্য বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ -

অর্থাৎ, জ্বিন ও মানুষকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্যেই সৃষ্টি করেছি। অন্য কোন কাজের জন্য নয়।

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-এর নিখুঁত প্রতিপালন নীতিই পূর্বের বাক্য اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ-এর দলীল বা প্রমাণ। সমগ্র সৃষ্টির লালন-পালনের দায়িত্ব একই পবিত্র সত্তার; তাই তারিফ-প্রশংসারও প্রকৃত

প্রাপক তিনিই; অন্য কেউ নয়। এজন্য প্রথম আয়াত الحمد لله رب العلمين-এ তারীফ-প্রশংসার সাথে ঈমানের প্রথম স্তম্ভ আল্লাহ্ তা'আলার একত্ব বা তওহীদের কথা অতি সূক্ষ্মভাবে এসে গেছে।

দ্বিতীয় আয়াতে তাঁর গুণ, দয়ার প্রসঙ্গ رحمن ও رحيم শব্দদ্বয়ের দ্বারা বর্ণনা করেছেন। উভয় শব্দই "গুণের আধিক্যবোধক বিশেষ্য" যাতে আল্লাহ্র দয়ার অসাধারণত্ব ও পূর্ণতার কথা বোঝায়। এ স্থলে এ গুণের উল্লেখ সম্ভবত এজন্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা যে সমগ্র সৃষ্টিজগতের লালন-পালন, ভরণ-পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং গ্রহণ করেছেন এতে তাঁর নিজস্ব কোন প্রয়োজন নেই বা অন্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েও নয়; বরং তাঁর রহমত বা দয়ার তাকীদেই তিনি এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। যদি সমগ্র সৃষ্টির অস্তিত্বও না থাকে, তাতেও তাঁর কোন লাভ-ক্ষতি নেই। আর যদি সমগ্র সৃষ্টি অবাধ্যও হয়ে যায় তবে তাতেও তাঁর কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই

ملك يوم الدين

مالك শব্দ ملك ধাতু হতে গঠিত। এর অর্থ কোন বস্তুর উপর এমন অধিকার থাকা, যাকে ব্যবহার, রদবদল, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সব কিছু করার সকল অধিকার থাকবে। دين অর্থ প্রতিদান দেয়া। مالك يوم الدين-এর শাব্দিক অর্থ—প্রতিদান-দিবসের মালিক বা অধিপতি। অর্থাৎ প্রতিদান-দিবসের অধিকার ও আধিপত্য কোন্ বস্তুর উপরে হবে, তার কোন বর্ণনা দেওয়া হয়নি। তফসীরে কাশশাফে বলা হয়েছে যে, এতে 'আম' বা অর্থের ব্যাপকতার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। অর্থাৎ, প্রতিদান দিবসে সকল সৃষ্টিরাজি ও সকল বিষয়ই আল্লাহ্ তা'আলার অধিকারে থাকবে। (কাশ্শাফ)

প্রতিদান দিবসের স্বরূপ ও তার প্রয়োজনীয়তা

প্রথমত, প্রতিদান দিবস কাকে বলে এবং এর স্বরূপ কি? দ্বিতীয়ত, সমগ্র সৃষ্টিরাজির উপর প্রতিদান দিবসে যেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলার একক অধিকার থাকবে, অনুরূপভাবে আজও সকল কিছুর উপর তাঁরই তো একক অধিকার রয়েছে; সুতরাং প্রতিদান দিবসের বৈশিষ্ট্য কোথায়?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে এই যে, 'প্রতিদান-দিবস' সে দিনকেই বলা হয়, যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা ভাল-মন্দ সকল কাজ-কর্মের প্রতিদান দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন। 'রোযে-জাযা' শব্দ দ্বারা বোঝান হয়েছে, দুনিয়া ভাল-মন্দ কাজ-কর্মের প্রকৃত ফলাফল পাওয়ার স্থান নয়; বরং ইহা কর্মস্থল, কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের জায়গা। যথার্থ প্রতিদান বা পুরস্কার গ্রহণেরও স্থান এটা নয়। এতে একথাও বোঝা যাচ্ছে যে, পৃথিবীতে কারও অর্থ-সম্পদের আধিক্য ও সুখ-শান্তির ব্যাপকতা দেখে বলা যাবে না যে, এ লোক আল্লাহ্‌র দরবারে মকবুল হয়েছেন বা তিনি আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র। অপরপক্ষে কাকেও বিপদাপদে পতিত দেখেও বলা যাবে না যে, তিনি আল্লাহ্‌র অভিশপ্ত। যেমনি করে কর্মস্থলে বা কারখানার কোন কোন লোককে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ব্যস্ত দেখে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাকে বিপদগ্রস্ত বলতে পারে না এবং সে নিজেও দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত বলে নিজেকে বিপদগ্রস্ত বলে ভাবে না; বরং সে এ ব্যস্ততাকে জীবনের সাফল্য বলেই গণ্য করে এবং যদি কেউ অনুগ্রহ করে তাকে এ ব্যস্ততা থেকে রেহাই দিতে চায়, তবে তাকে সে সবচেয়ে বড় ক্ষতি বলে মনে করে। সে তার এ ত্রিশ দিনের পরিশ্রমের অন্তরালে এমন এক আরাম দেখতে পায়, যা তার বেতনস্বরূপ সে লাভ করে।

এই জন্যই নবীগণ এ দুনিয়ার জীবনে সর্বাপেক্ষা বেশ বিপদাপদে পড়েছেন এবং তারপর ওলী-আওলিয়াগণ সবচেয়ে বেশী বিপদে পড়েছেন। কিন্তু দেখা গেছে, বিপদের তীব্রতা যত কঠিনই হোক না কেন, দৃঢ়পদে তাঁরা তা সহ্য করেছেন। এমনকি আনন্দিত চিত্তেই তাঁরা তা মেনে নিয়েছেন। মোটকথা, দুনিয়ার আরাম-আয়েশকে সত্যবাদিতা ও সঠিকতা এবং বিপদাপদকে খারাপ কাজের নিদর্শন বলা যায় না।

অবশ্য কখনো কখনো কোন কোন কর্মের সামান্য ফলাফল দুনিয়াতেও প্রকাশ করা হয় বটে, তবে তা সেকাজের পূর্ণ বদল হতে পারে না। এগুলো সাময়িকভাবে সতর্ক করার জন্য একটু নিদর্শন মাত্র। এ প্রসঙ্গে আল-কোরআনে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ - অর্থাৎ, এবং আমরা মানুষকে (পরকালের বড় শাস্তির) আগেই দুনিয়াতে কিছু শাস্তি দিয়ে থাকি, যেন তারা মন্দ কাজ থেকে ফিরে আসে।

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে ঃ

كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ -

অর্থাৎ—এরূপ শাস্তি হয়ে থাকে এবং পরকালের শাস্তি আরো বড়, যদি তা তারা বুঝে!

মোটকথা, দুনিয়ার আরাম-আয়েশ এবং বিপদাপদ কোন কোন সময় পরীক্ষা-স্বরূপও হয়ে থাকে, আবার কোন কোন সময় সতর্কীকরণের জন্যও শাস্তিরূপে প্রবর্তিত হয়।

কিন্তু তা কর্মের পূর্ণ ফলাফল নয়, সামান্য নমুনা মাত্র। কেননা, এ সব কিছুই ক্ষণিকের এবং ক্ষণস্থায়ী। চিরস্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ও শাস্তি হবে পরকালে। যেদিন সে শান্তি অথবা শাস্তি দেওয়া হবে, সেদিনের নামই প্রতিদান দিবস। যখন বোঝা গেল যে, ভাল ও মন্দ কাজের পরিপূর্ণ প্রতিদানের স্থান এ পৃথিবী নয়, তখন বিচার-বুদ্ধিও যুক্তির কথা হচ্ছে এই যে, ভাল ও মন্দ যেন একই পর্যায়ভুক্ত হয়ে না যায়, সে জন্য প্রত্যেক কাজের প্রতিদান অবশ্যই পাওয়া উচিত। এজন্যই এ জগৎ ব্যতীত একটি ভিন্ন জগতের প্রয়োজন। যেখানে ছোট-বড়, ভাল-মন্দ সকল কাজের প্রতিদান ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে দেওয়া হবে। কোরআনের ভাষায় তাকেই 'প্রতিদান দিবস'—কিয়ামত বা পরকাল বলা হয়।

সূরা আল-মু'মিনে আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয়ে বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَلَا الْمُسِيءُ ط قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ ۝ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ
فِيهَا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

অর্থাৎ—অন্ধ এবং দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি যেমন এক পর্যায়ের নয়, তেমনি যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করে, আর যারা মন্দ কাজ করে তারা পরস্পর সমান নয়। তোমরা অত্যন্ত কম বুঝ। কিয়ামত অবশ্যই হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা বিশ্বাস করে না।

মালিক কে ?

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ বাক্যটিতে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই একথা জানেন যে, সেই একক সত্তাই প্রকৃত মালিক, যিনি সমগ্র সৃষ্টি-জগতকে সৃষ্টি করেছেন এবং এর লালন-পালন ও বর্ধনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং যাঁর মালিকানা পূর্ণরূপে প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই সর্বাবস্থায় পরিব্যাপ্ত। অর্থাৎ— প্রকাশ্যে, গোপনে, জীবিতাবস্থায় ও মৃতাবস্থায় তিনিই একমাত্র মালিক এবং যার মালিকানার আরম্ভ নেই, শেষও নেই। এ মালিকানার সাথে মানুষের মালিকানার কোন তুলনা চলে না। কেননা, মানুষের মালিকানা আরম্ভ ও শেষের চৌহদ্দিতে সীমাবদ্ধ। এক সময় তা চলে না, কিছু দিন পরেই তা থাকবে না। অপরদিকে মানুষের মালিকানা হস্তান্তরযোগ্য। বস্তুর বাহ্যিক দিকের ওপরই তা বর্তায়, গোপনীয় দিকের ওপর নয়। জীবিতের ওপর, মৃতের ওপর নয়। এজন্যই প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ্ তা'আলার মালিকানা কেবলমাত্র প্রতিদান দিবসেই নয়, পৃথিবীতেও সমস্ত সৃষ্টজগতের প্রকৃত মালিক আল্লাহ্ তা'আলা। তবে এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার মালিকানা বিশেষভাবে 'প্রতিদান-দিবসের' এ কথা বলার তাৎপর্য কি ? আল-কোরআনের অন্য আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে, যদিও দুনিয়াতেও প্রকৃত মালিকানা আল্লাহ্ তা'আলারই, কিন্তু তিনি দয়াপরবশ হয়ে আংশিক বা ক্ষণস্থায়ী মালিকানা মানবজাতিকেও দান করেছেন এবং জাগতিক জীবনের আইনে এ মালিকানার প্রতি সম্মানও দেখানো হয়েছে। বিশ্বচরাচরে মানুষ ধন-সম্পদ, জায়গা-জমি, বাড়ীঘর এবং আসবাব-পত্রের ক্ষণস্থায়ী মালিক হয়েও এতে একেবারে ডুবে রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ একথা ঘোষণা করে এ অহংকারী ও নির্বোধ মানব-সমাজকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তোমাদের এ মালিকানা, আধিপত্য ও সম্পর্ক মাত্র কয়েক দিনের এবং ক্ষণিকের। এমন দিন অতি সত্বরই আসছে, যে দিন কেউই জাহেরী মালিকও থাকবে না, কেউ কারো দাস বা কেউ কারো সেবা পাবার উপযোগীও থাকবে না। সমস্ত বস্তুর মালিকানা এক একক সত্তার হয়ে যাবে। এ আয়াতের বিস্তারিত বর্ণনা সূরা আল-মু'মিনের এ আয়াতে দেওয়া হয়েছে ঃ

يَوْمَ هُمْ بَارِزُوْنَ لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ

اَلْمُلْكُ الْيَوْمَ ط لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ○ اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَاظُلْمَ الْيَوْمَ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○

অর্থ—"যেদিন সমস্ত মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে উপস্থিত হবে, সেদিন তাদের কোন কথাই আল্লাহ্‌র নিকট গোপন থাকবে না। আজ কার রাজত্ব ? (উত্তরে) সে আল্লাহ্ তা'আলার যিনি একক ও পরাক্রান্ত। আজ প্রত্যেককে তার কর্মফল দান করা হবে। আজ কারো প্রতি অবিচার করা হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা অতি তাড়াতাড়ি হিসাব নিতে পারেন।"

সূরা আল-ফাতিহার প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ সূরার প্রথম তিনটি আয়াতে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও তা'রীফের বর্ণনা করা হয়েছে এবং এর তফসীরে একথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, তা'রীফ ও প্রশংসার সাথে-সাথে ঈমানের মৌলিক নীতি ও আল্লাহ্‌র একত্ব-বাদের বর্ণনাও সূক্ষ্মভাবে দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয় আয়াতের তফসীরে আপনি অবগত হলেন যে, এর দু'টি শব্দে তা'রীফ ও প্রশংসার সাথে সাথে ইসলামের বিপ্লবাত্মক মহত্তম আকীদা যথা কিয়ামত ও পরকালের বর্ণনা প্রমাণসহ উপস্থিত করা হয়েছে।

এখন চতুর্থ আয়াতের বর্ণনা ঃ—اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

এ আয়াতের এক অংশে তা'রীফ ও প্রশংসা এবং অপর অংশে দোয়া ও দরখাস্ত। نَعْبُدُ — عبادت শব্দ হতে গঠিত। এর অর্থ হচ্ছে ঃ কারো প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা ও ভালবাসার দরুন তাঁর নিকট নিজের আন্তরিক কাকুতি-মিনতি প্রকাশ করা। نَسْتَعِيْنُ- استعانت হতে গঠিত। এর অর্থ হচ্ছে কারো সাহায্য প্রার্থনা করা। আয়াতের অর্থ হচ্ছে, 'আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং একমাত্র তোমার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করি।' মানবজীবন তিনটি অবস্থায় অতিবাহিত হয়। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। পূর্বের তিনটি আয়াতের মধ্যে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اَلرَّحْمٰنِ এবং اَلرَّحِيْمِ এ দুটি আয়াতে মানুষকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, অতীতে সে কেবল একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার মুখাপেক্ষী ছিল, বর্তমানেও সে একমাত্র তাঁরই মুখা-পেক্ষী। অস্তিত্বহীন এক অবস্থা থেকে তিনি তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন। তাকে সকল

সৃষ্টির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর আকার-আকৃতি এবং বিবেক ও বুদ্ধি দান করেছেন। বর্তমানে তার লালন-পালন ও ভরণ-পোষণের নিয়মিত সুব্যবস্থা তিনিই করেছেন। অতঃপর مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ এর মধ্যে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ভবিষ্যতেও সে আল্লাহ্ তা'আলারই মুখাপেক্ষী। প্রতিদান দিবসে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো সাহায্য পাওয়া যাবে না।

এ তিনটি আয়াতের দ্বারা যখন একথা প্রমাণিত হলো যে, মানুষ তার জীবনের তিনটি কালেই একান্তভাবে আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী, তাই সাধারণ যুক্তির চাহিদাও এই যে, ইবাদতও তাঁরই করতে হবে। কেননা, ইবাদত যেহেতু অশেষ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথে নিজের অফুরন্ত কাকুতি-মিনতি নিবেদন করার নাম, সুতরাং তা পাওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন অন্য কোন সত্তা নেই। ফল কথা এই যে, একজন বুদ্ধিমান ও বিবেকবান ব্যক্তি মনের গভীরতা থেকেই এ স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতি উচ্চারণ করছে যে, আমরা তোমাকে ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করি না। এ মৌলিক চাহিদাই إِيَّاكَ نَعْبُدُ তে বর্ণনা করা হয়েছে।

যখন স্থির হলো যে, অভাব পূরণকারী একক সত্তা আল্লাহ্ তা'আলা, সুতরাং নিজের সকল কাজে সাহায্যও তাঁর নিকটই চাওয়া দরকার। এ মৌলিক চাহিদারই বর্ণনা وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -এ করা হয়েছে। মোটকথা, এ চতুর্থ আয়াতে একদিকে আল্লাহ্ তা'রীফ ও প্রশংসার সাথে একথারও স্বীকৃতি রয়েছে যে, ইবাদত ও শ্রদ্ধা পাওয়ার একমাত্র তিনিই যোগ্য। অপরদিকে তাঁর নিকট সাহায্য ও সহায়তার প্রার্থনা করা এবং তৃতীয়ত আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করার শিক্ষাও দেওয়া হয়েছে। এতদসঙ্গে এও বলে দেওয়া হয়েছে যে, কোন বান্দাই আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকেও অভাব পূরণকারী মনে করবে না। অপর কারো নিকট প্রার্থনার হাত প্রসারিত করা যাবে না। অবশ্য কোন নবী বা কোন ওলীর বরাত দিয়ে প্রার্থনা করা এ আয়াতের মর্মবিরোধী নয়।

এ আয়াতে এ বিষয়ও চিন্তা করা কর্তব্য যে, "আমরা তোমারই নিকট সাহায্য চাই।" কিন্তু কোন্ কাজের সাহায্য চাই, তার কোন উল্লেখ নেই। জমহুর মুফাস-সিরীনের অভিমত এই যে, নির্দিষ্ট কোন ব্যাপারে সাহায্যের কথা উল্লেখ না করে আ'ম বা সাধারণ সাহায্যের প্রতি ইশারা করা হয়েছে যে, আমি আমার ইবাদত

এবং প্রত্যেক ধর্মীয় ও পার্থিব কাজে এবং অন্তরে পোষিত প্রতিটি আশা-আকাঙ্ক্ষায় কেবল তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।

ইবাদত শুধু নামায-রোযারই নাম নয়। ইমাম গাযযালী স্বীয় গ্রন্থ 'আরবাঈন'-এ দশ প্রকার ইবাদতের কথা লিখেছেন। যথা—নামায, যাকাত, রোযা, কোরআন তিলাওয়াত, সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র স্মরণ, হালাল উপার্জনের চেষ্টা করা, প্রতিবেশী এবং সাথীদের প্রাপ্য পরিশোধ করা, মানুষকে সৎকাজের আদেশ ও খারাপ কাজ হতে বিরত থাকার উপদেশ দেওয়া, রসূলের সুন্নত পালন করা।

একই কারণে ইবাদতে আল্লাহ্র সাথে কাউকেও অংশীদার করা চলে না। এর অর্থ হচ্ছে, কারো প্রতি ভালবাসা আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসার সমতুল্য হবে না। কারো প্রতি ভয়, কারো প্রতি আশা-আকাঙ্ক্ষা পোষণ আল্লাহ্র ভয় ও তাঁর প্রতি পোষিত আশা-আকাঙ্ক্ষার সমতুল্য হবে না। আবার কারো ওপর একান্ত ভরসা করা, কারো আনুগত্য ও খেদমত করা, কারো কাজকে আল্লাহ্র ইবাদতের সমতুল্য আবশ্যকীয় মনে করা, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নামে মানত করা, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো সামনে স্বীয় কাকুতি-মিনতি প্রকাশ করা এবং যে কাজে অন্তরের আবেগ-আকুতি প্রকাশ পায়, এমন কাজ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো জন্য করা যথা রুকু বা সেজদা করা ইত্যাদি কোন অবস্থাতেই বৈধ হবে না।

শেষ তিনটি আয়াতে মানুষের দোয়া ও আবেদনের বিষয়বস্তু এবং এক বিশেষ প্রার্থনা-পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। তা হচ্ছে ঃ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝
غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

অর্থাৎ—আমাদিগকে সরল পথ দেখাও ; সে সমস্ত মানুষের পথ, যারা তোমার অনুগ্রহ লাভ করেছে। যে পথে তোমার অভিশপ্ত বান্দাগণ চলেছে সে পথে নয়, এবং ঐ সমস্ত লোকের রাস্তাও নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

এ তিনটি আয়াতে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যেমন সরল পথের হেদায়েতের জন্য যে আবেদন এ আয়াতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, এর আবেদনকারী যেমনি-ভাবে সাধারণ মানুষ, সাধারণ মুমিনগণ, ঠিক অনুরূপভাবে আওলিয়া, গাউস-কুতুব এবং নবী-রসূলগণও। নিঃসন্দেহে যাঁরা হেদায়েতপ্রাপ্ত, বরং অন্যের হেদায়েতের উৎসস্বরূপ, তাঁদের পক্ষে পুনরায় সে হেদায়েতের জন্যই বারংবার প্রার্থনা করার উদ্দেশ্য কি?

এ প্রশ্নের উত্তর 'হেদায়েত' শব্দের তাৎপর্য পরিপূর্ণরূপে অনুধাবন করার ওপর নির্ভরশীল। এ বিষয়ে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন, যাতে আলোচ্য প্রশ্নের উত্তর ছাড়াও 'হেদায়েত' শব্দের তাৎপর্য সম্পর্কে অজ্ঞ লোকেরা যেসব পরস্পর বিরোধিতা আঁচ করেন তাদের সকল প্রশ্নেরও মীমাংসা হয়ে যায়।

ইমাম রাগেব ইস্ফাহানী 'মুফরাদাতুল-কোরআনে' হেদায়েত শব্দের অতি সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এর সারমর্ম হচ্ছে, 'কাউকে গন্তব্যস্থানের দিকে অনুগ্রহের সাথে পথ প্রদর্শন করা।' তাই হেদায়েত করা প্রকৃত প্রস্তাবে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই কাজ এবং এর বিভিন্ন স্তর রয়েছে। হেদায়েতের একটি স্তর হচ্ছে সাধারণ ও ব্যাপক। এতে সমগ্র সৃষ্টি অন্তর্ভুক্ত। জড় পদার্থ উদ্ভিদ এবং প্রাণী জগৎ পর্যন্ত এর আওতাধীন। প্রসঙ্গত প্রশ্ন উঠতে পারে যে, প্রাণহীন জড় পদার্থ বা ইতর প্রাণী ও উদ্ভিদ-জগতের সঙ্গে হেদায়েতের সম্পর্ক কোথায় ?

কোরআনের শিক্ষায় স্পষ্টতই এ তথ্য ব্যক্ত হয়েছে যে, সৃষ্টির প্রতিটি স্তর, এমনকি প্রতিটি অণু-পরমাণু পর্যন্ত নিজ নিজ অবস্থানুযায়ী প্রাণ ও অনুভূতির অধিকারী। স্ব-স্ব পরিমণ্ডলে প্রতিটি বস্তুর বুদ্ধি-বিবেচনা রয়েছে। অবশ্য এ বুদ্ধি ও অনুভূতির তারতম্য রয়েছে। কোনটাতে তা স্পষ্ট এবং কোনটাতে নিতান্তই অনুল্লেখ্য। যে সমস্ত বস্তুতে তা অতি অল্পমাত্রায় বিদ্যমান সেগুলোকে প্রাণহীন বা অনুভূতিহীন বলা যায়। বুদ্ধি ও অনুভূতির ক্ষেত্রে এ তারতম্যের জন্যই সমগ্র সৃষ্টিজগতের মধ্যে একমাত্র মানুষ ও জ্বিন জাতিকেই শরীয়তের হুকুম-আহকামের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। কারণ, সৃষ্টির এ দুটি স্তরের মধ্যেই বুদ্ধি ও অনুভূতি পূর্ণমাত্রায় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, তাই বলে একথা বলা যাবে না যে, একমাত্র মানুষ ও জ্বিন জাতি ছাড়া সৃষ্টির অন্য কোন কিছুর মধ্যে বুদ্ধি ও অনুভূতির অস্তিত্ব নেই। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন ঃ

وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِنْ لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ -

অর্থাৎ—এমন কোন বস্তু নেই যা আল্লাহ্র প্রশংসার তস্বীহ্ পাঠ করে না, কিন্তু তোমরা তাদের তসবীহ বুঝতে পার না। (সূরা বনী-ইসরাঈল)

সূরা নূরে এরশাদ হয়েছে ঃ

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ

صَافَّاتٍ ط كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ -

অর্থাৎ—তোমরা কি জান না যে, আসমান-যমীনে যা কিছু রয়েছে, সকলেই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা ও গুণগান করে? বিশেষত পাখীকুল যারা দু'পাখা বিস্তার করে শূন্যে উড়ে বেড়ায়, তাদের সকলেই স্ব-স্ব দোয়া-তসবীহ সম্পর্কে জ্ঞাত এবং আল্লাহ্ তা'আলাও ওদের তসবীহ্ সম্পর্কে খবর রাখেন।

একথা সর্বজনবিদিত যে, আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয়ের ওপরই তাঁর তা'রীফ ও প্রশংসা নির্ভরশীল। আর এ কথাও স্বতঃসিদ্ধ যে, আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ করাই সর্বাপেক্ষা বড় জ্ঞান। এটা বুদ্ধি-বিবেক ও অনুভূতি ব্যতীত সম্ভব নয়। এ আয়াতগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তুরই প্রাণ ও জীবন আছে এবং বুদ্ধি ও অনুভূতিও রয়েছে। তবে কোন কোনটির মধ্যে এর পরিমাণ এত অল্প যে, সাধারণ দৃষ্টিতে তা অনুভব করা যায় না। তাই পরিভাষাগতভাবে ওগুলোকে প্রাণহীন ও বুদ্ধিহীন জড় পদার্থ বলা হয়। আর এ জন্যেই ওদেরকে শরয়ী আদেশের আওতাভুক্ত করা হয়নি। গোটা বস্তুজগত সম্পর্কিত এ মীমাংসা আল-কোরআনে সে যুগেই দেওয়া হয়েছিল, যে যুগে পৃথিবীর কোথাও আধুনিককালের কোন দার্শনিকও ছিল না, দর্শনবিদ্যার কোন পুস্তকও রচিত হয়নি। পরবর্তী যুগের দার্শনিকগণ এ তথ্যের যথার্থতা স্বীকার করেছেন এবং প্রাচীন দার্শনিকদের মধ্যেও এ মত পোষণ করার মত অনেক লোক ছিল। মোটকথা, আল্লাহ্‌র হেদায়েতের এ প্রথম স্তরে সমস্ত সৃষ্টিজগত যথা—জড় পদার্থ, উদ্ভিদ, প্রাণীজগত, মানবমণ্ডলী ও জ্বিন প্রভৃতি সকলেই অন্তর্ভুক্ত। এ সাধারণ হেদায়েতের উল্লেখই আল-কোরআনের এ আয়াতে أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ করা হয়েছে। অর্থাৎ—"আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্ব দান করেছেন এবং সে অনুপাতে তাকে হেদায়েত দান করেছেন।"

এ বিষয়ে সূরা আ'লায় এরশাদ হয়েছে ঃ

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ -

অর্থাৎ—তোমরা তোমাদের মহান পালনকর্তার গুণগান কর। যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং সেগুলোকে সঠিক অবস্থা দান করেছেন। যিনি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন এবং পথ দেখিয়েছেন।

অর্থাৎ যিনি সমস্ত সৃষ্টিজগতের জন্য বিশেষ অভ্যাস এবং বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব নির্ধারণ করেছেন এবং সে মেজাজ ও দায়িত্বের উপযোগী হেদায়েত দান করেছেন। এ ব্যাপারে হেদায়েতের পরিকল্পনা অনুযায়ী সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তুই অতি নিপুণভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে চলেছে। যে বস্তুকে যে কাজের

জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সে সেই কাজ অত্যন্ত গুরুত্ব ও নৈপুণ্যের সাথে পালন করছে। যথা—মুখ হতে নির্গত শব্দ নাক বা চক্ষু কেউই শ্রবণ করতে পারে না, অথচ এ দুটি মুখের নিকটতম অঙ্গ। পক্ষান্তরে এ দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলা যেহেতু কানকে অর্পণ করেছেন, তাই একমাত্র কানই মুখের শব্দ শ্রবণ করে ও বুঝে। অনুরূপভাবে কান দ্বারা দেখা বা ঘ্রাণ লওয়ার কাজ করা চলে না। নাক দ্বারা শ্রবণ করা বা দেখার কাজও করা চলে না।

সূরা মরিয়মে এ বিষয়ে এরশাদ হয়েছে ঃ

إِنْ كُلُّ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّاۤ اٰتِى الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ـ

অর্থাৎ—আকাশ ও যমীনে এমন কোন বস্তু নেই, যা আল্লাহ্র বান্দারূপে আগমন করেনি।

হেদায়েতের দ্বিতীয় স্তর এর তুলনায় অনেকটা সংকীর্ণ। অর্থাৎ সে সমস্ত বস্তুর সাথে জড়িত, পরিভাষায় যাদেরকে বিবেকবান বুদ্ধিসম্পন্ন বলা হয়। অর্থাৎ—মানুষ এবং জিন জাতি। এ হেদায়েত নবী-রসূল ও আসমানী কিতাবের মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের নিকট পেঁৗছেছে। কেউ এ হেদায়েতকে গ্রহণ করে মুমিন হয়েছে আবার কেউ একে প্রত্যাখ্যান করে কাফির-বেদ্বীনে পরিণত হয়েছে।

হেদায়েতের তৃতীয় স্তর আরো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তা শুধু মু'মিন ও মুত্তাকী বা ধর্ম-ভীরুদের জন্য। এ হেদায়েত আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন প্রকার মাধ্যম ব্যতীতই মানুষকে প্রদান করা হয়। এরই নাম তওফীক। অর্থাৎ এমন অবস্থা, পরিবেশ ও মনোভাব সৃষ্টি করে দেওয়া যে, তার ফলে কোরআনের হেদায়েতকে গ্রহণ করা এবং এর ওপর আমল করা সহজসাধ্য হয়ে এবং এর বিরুদ্ধাচরণ কঠিন হয়ে পড়ে। এ তৃতীয় স্তরের পরিসীমা অতি ব্যাপক। এ স্তরই মানবের উন্নতির ক্ষেত্র। নেক কাজের সাথে এ হেদায়েতের বৃদ্ধি হতে থাকে। কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে এ বৃদ্ধির উল্লেখ রয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ـ

অর্থাৎ—"যারা আমার পথে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে আমি তাদেরকে আমার পথে আরো অধিকতর অগ্রসর হওয়ার পথ অবশ্যই দেখিয়ে থাকি।" এটি সেই কর্মক্ষেত্র যেখানে নবী-রসূল এবং বড় বড় ওলী-আওলিয়া, কুতুবগণকেও জীবনের শেষ মুহূর্ত

পর্যন্ত আরো অধিকতর হেদায়েত ও তওফীকের জন্য চেষ্টায় রত থাকতে দেখা গেছে।

হেদায়েতের এ ব্যাখ্যার দ্বারা স্পষ্টভাবে বোঝা গেল যে, হেদায়েত এমন এক বস্তু যা সকলেই লাভ করেছে এবং এর আধিক্য লাভ করার জন্য বড় হতে বড় ব্যক্তির পক্ষেও কোন বাধা-নিষেধ নেই। এ জন্যই সূরা আল-ফাতিহায় গুরুত্বপূর্ণ দোয়ারূপে হেদায়েত প্রার্থনা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যা একজন সাধারণ মু'মিনের জন্যও উপযোগী, আবার একজন বড় হতে বড় রসূলের জন্যও উপযোগী। এজন্যই হযরত রসূলে আকরাম (সা)-এর শেষ জীবনে সূরা ফাত্হে মক্কাবিজয়ের ফলাফল বর্ণনা করতে গিয়ে একথাও বলা হয়েছে যে, وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا অর্থাৎ মক্কা বিজয় এজন্যই আপনার দ্বারা সম্পন্ন করা হয়েছে, যাতে সিরাতে-মুস্তাকীমের হেদায়েত লাভ হয়।

রসূলুল্লাহ্ (সা) কেবল নিজেই হেদায়েতপ্রাপ্ত ছিলেন না; বরং অন্যের জন্যও ছিলেন হেদায়েতের উৎস। এমতাবস্থায় তাঁর হেদায়েত লাভের একমাত্র অর্থ হতে পারে, এ সময় হেদায়েতের কোন উচ্চতর অবস্থা তিনি লাভ করেছেন।

হেদায়েতের এ ব্যাখ্যা পবিত্র কোরআন বুঝবার ক্ষেত্রে যে সব ফায়দা প্রদান করবে সংক্ষেপে তা নিম্নরূপ ঃ

এক পবিত্র কোরআনের কোথাও কোথাও মু'মিন ও কাফের নির্বিশেষে সবার জন্যই হেদায়েত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আবার কোথাও শুধুমাত্র মুত্তাকীদের জন্য বিশেষ অর্থে হেদায়েত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে করে অজ্ঞ লোকদের পক্ষে সন্দেহে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু হেদায়েতের সাধারণ ও বিশেষ স্তরসমূহ জানার পর এ সন্দেহ আপনা-আপনিতেই দূরীভূত হয়ে যাবে। বুঝতে হবে যে, কারো বেলায় ব্যাপক অর্থে এবং কারো বেলায় বিশেষ অর্থে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

দুই. আল-কোরআনের স্থানে স্থানে এরশাদ হয়েছে যে, জালেম ও ফাসেকদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা হেদায়েত দান করেন না। অন্যত্র বারবার এরশাদ হয়েছে যে, তিনি সকলকেই হেদায়েত দান করেন। এর উত্তর ও হেদায়েতের স্তরসমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলে দেওয়া হয়েছে যে, হেদায়েতের ব্যাপক অর্থে সকলেই হেদায়েতপ্রাপ্ত এবং বিশেষ অর্থে জালেম ও ফাসেকরা বাদ পড়েছে।

তিন. হেদায়েতের তিনটি স্তরের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় স্তর সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এ পর্যায়ের হেদায়েত একান্তভাবে একমাত্র তাঁরই কাজ। এতে নবী-রসূলগণেরও কোন অধিকার নেই। নবী-রসূলগণের কাজ শুধু হেদায়েতের দ্বিতীয় স্তরে সীমিত। কোরআনের যেখানে যেখানে নবী-রসূলগণকে হেদায়েতকারী বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তা হেদায়েতের দ্বিতীয় স্তরের ভিত্তিতেই বলা হয়েছে। আর যেখানে এরশাদ হয়েছে : إِنَّكَ لَنْ تَهْدِىْ مَنْ أَحْبَبْتَ অর্থাৎ "আপনি যাকে চান তাকেই হেদায়েত করতে পারবেন না"—এতে হেদায়েতের তৃতীয় স্তরের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ কাউকে তওফীক দান করা আপনার কাজ নয়।

মোটকথা, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ একটি ব্যাপক ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দোয়া, যা মানুষকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। মানবসমাজের কোন ব্যক্তিই এর আওতার বাইরে নেই। কেননা, সরল-সঠিক পথ ব্যতীত দ্বীন-দুনিয়ার কোন কিছুতেই উন্নতি ও সাফল্য সম্ভব নয়। দুনিয়ার আবর্তন-বিবর্তনের মধ্যেও সিরাতে-মুস্তাকীমের প্রার্থনা পরশপাথরের মত কিন্তু মানুষ তা লক্ষ্য করে না। আয়াতের অর্থ হচ্ছে : "আমাদিগকে সরল পথ দেখিয়ে দিন।"

সরল পথ কোন্‌টি? 'সোজা সরল রাস্তা' সে পথকে বলে, যাতে কোন মোড় বা ঘোরপ্যাঁচ নেই। এর অর্থ হচ্ছে, ধর্মের সে রাস্তা যাতে 'ইফরাত' বা 'তফরীত' -এর অবকাশ নেই। ইফরাতের অর্থ সীমা অতিক্রম করা এবং তফ্‌রীত অর্থ মর্জিমত কাট-ছাট করে নেওয়া। এরশাদ হয়েছে : صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

অর্থাৎ -যে সকল লোক আপনার অনুগ্রহ লাভ করেছে তাদের রাস্তা। যে সকল ব্যক্তি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ লাভ করেছে, তাদের পরিচয় অন্য একটি আয়াতে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে :

اَلَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ -

অর্থাৎ—যাদের প্রতি আল্লাহ্ পাক অনুগ্রহ করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সৎকর্মশীল সালেহীন। আল্লাহ্‌র দরবারে মকবুল উপরোক্ত লোকদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তর নবীগণের। অতঃপর নবীগণের উম্মতের মধ্যে যাঁরা

সর্বাপেক্ষা বড় মরতবা ও মর্যাদার অধিকারী, তাঁরা হলেন সিদ্দীক। যাঁদের মধ্যে রূহানী কামালিয়াত ও পরিপূর্ণতা রয়েছে, সাধারণ ভাষায় তাঁদেরকে 'আওলিয়া' বলা হয়। আর যাঁরা দ্বীনের প্রয়োজনে স্বীয় জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেছেন, তাঁদেরকে বলা হয় শহীদ। আর সালেহীন হচ্ছেন—যাঁরা ওয়াজিব, মুস্তাহাব প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে শরীয়তের পুরোপুরি অনুসরণ ও আমলকারী, সাধারণ পরিভাষায় এঁদেরকে দ্বীনদার বলা হয়।

এ আয়াতের প্রথম অংশে হাঁ-সূচক বাক্য ব্যবহার করে সরল পথের সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। উপরোক্ত চার স্তরের মানুষ যে পথে চলেছেন তাই সরল পথ। পরে শেষ আয়াতে না-সূচক বাক্য ব্যবহার করেও এর সমর্থন করা হয়েছে। বলা হয়েছে: غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ অর্থাৎ—যারা আপনার অভিসম্পাত-গ্রস্ত তাদের পথ নয় এবং তাদের পথও নয়, যারা পথহারা হয়েছে।

مَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ বলতে ঐ সকল লোককে বোঝানো হয়েছে, যারা ধর্মের হুকুম-আহকামকে বুঝে-জানে, তবে স্বীয় অহমিকা ও ব্যক্তিগত স্বার্থের বশবর্তী হয়ে বিরুদ্ধাচরণ করেছে। অন্য শব্দে বলা যায়, যাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ মান্য করতে গাফলতি করেছে। যেমন, সাধারণভাবে ইহুদীদের নিয়ম ছিল, সামান্য স্বার্থের জন্য দ্বীনের নিয়ম-নীতি বিসর্জন দিয়ে তারা নবী-রসূলগণের অবমাননা পর্যন্ত করতে দ্বিধাবোধ করত না। ضَالِّيْن —তাদেরকে বলা হয়, যারা না বুঝে অজ্ঞতার দরুন ধর্মীয় ব্যাপারে ভুল পথের অনুসারী হয়েছে এবং ধর্মের সীমালঙ্ঘন করে অতি-রঞ্জনের পথে অগ্রসর হয়েছে। যথা—নাসারাগণ। তারা নবীর শিক্ষাকে অগ্রাধিকার প্রদানের নামে বাড়াবাড়ি করেছে ; যেমন নবীদেরকে আল্লাহ্‌র পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে। ইহুদীদের বেলায় এটা অন্যায় এজন্য যে, তারা আল্লাহ্‌র নবীদের কথা মানেনি ; এমন কি তাঁদেরকে হত্যা পর্যন্ত করেছে।

আয়াতের সারমর্ম হচ্ছে—আমরা সে পথ চাই না, যা নফসানী উদ্দেশ্যের অনুগত হয় এবং মন্দ কাজে উদ্বুদ্ধ করে ও ধর্মের মধ্যে সীমালঙ্ঘনের প্রতি প্ররোচিত করে। সে পথও চাই না, যে পথ অজ্ঞতা ও মূর্খতার দরুন ধর্মের সীমারেখা অতিক্রম করে। বরং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সোজা-সরল পথ চাই। যার মধ্যে না অতিরঞ্জন আছে, আর না কম-কছুরী আছে এবং যা নফসানী প্রভাব ও সংশয়ের ঊর্ধ্বে।

সূরা আল-ফাতিহার আয়াত সাতটির তফসীর শেষ হয়েছে। এখন সমগ্র সূরার সারমর্ম হচ্ছে এ দোয়া—"হে আল্লাহ্! আমাদিগকে সরল পথ দান করুন।

কেননা, সরল পথের সন্ধান লাভ করাই সবচাইতে বড় জ্ঞান ও সর্বাপেক্ষা বড় কামিয়াবী। বস্তুত সরল পথের সন্ধানে ব্যর্থ হয়েই দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি ধ্বংস হয়েছে। অন্যথায় অ-মুসলমানদের মধ্যেও সৃষ্টিকর্তার পরিচয় লাভ করা এবং তাঁর সন্তুষ্টির পথ অনুসরণ করার আগ্রহ-আকুতির অভাব নেই। এজন্যই কোরআন পাকে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় পদ্ধতিতেই সিরাতে-মুস্তাকীমের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

আল্লাহ্র কিতাবের শিক্ষা এবং তাঁর প্রিয় বান্দাদের অনুসরণের মধ্যেই সরল পথ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা রয়েছে ঃ এখানে একটা বিষয় বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। আর এ ব্যাপারে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে জ্ঞানের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়ে যায়। তা হচ্ছে, সিরাতে-মুস্তাকীম নির্ধারণ করার জন্য বস্তুত সিরাতে রাসূল, সিরাতে-কোরআন বলে দেওয়াই তো যথেষ্ট ছিল। উপরোক্ত দু'টি পথ চিহ্নিত করা যেমন সংক্ষিপ্ত ছিল, তেমনি ছিল সুস্পষ্ট। কেননা সমগ্র কোরআনই তো সিরাতে মুস্তাকীমের বিস্তারিত বর্ণনা। অপরদিকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সমগ্র শিক্ষা হচ্ছে কোরআনেরই বিস্তারিত বর্ণনা। অথচ আলোচ্য এ ছোট্ট সূরাটির দু'টি আয়াতে সহজ এবং স্বচ্ছ দু'টি পন্থা বাদ দিয়ে প্রথমে ইতিবাচক এবং পরে নেতিবাচক পদ্ধতিতে সিরাতে-মুস্তাকীমকে চিহ্নিত করতে গিয়ে বলেছেন—যদি সিরাতে মুস্তাকীম চাও, তবে এ সমস্ত লোককে তালাশ করে তাদের পথ অবলম্বন কর। কেননা, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এ দুনিয়াতে চিরকাল অবস্থান করবেন না। তাঁর পরে আর কোন নবী বা রসূলেরও আগমন হবে না। তাই তাঁদের মধ্যে নবীগণ ছাড়াই সিদ্দীক, শহীদান ও সালেহীনকেও অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। কারণ, কিয়ামত পর্যন্ত এঁদের অস্তিত্ব দুনিয়াতে থাকবে।

ফল কথা এই যে, সরল পথ অনুসন্ধানের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা কিছু সংখ্যক মানুষের সন্ধান দিয়েছেন ; কোন পুস্তকের হাওয়ালা দেন নি। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সাহাবীগণকে জানিয়েছেন যে, আমার উম্মতও পূর্ববর্তী উম্মতগণের ন্যায় সত্তুরটি দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। তন্মধ্যে মাত্র একটি দলই পথে থাকবে। তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, সেটি কোন্ দল ? প্রত্যুত্তরে তিনি যা বলেছিলেন, তাতেও তিনি কিছু লোকের সন্ধান দিয়েছেন। এরশাদ করেছেন ঃ ما انا عليه واصحابى অর্থাৎ আমি এবং আমার সাহাবীগণ যে পথে রয়েছি সে পথই সত্য ও ন্যায়ের পথ। বিশেষ ধরনের এ বর্ণনা পদ্ধতিতে হয়তো সে দিকে ইশারা করা হয়েছে যে, মানুষের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা-দীক্ষা কেবলমাত্র কিতাব ও বর্ণনা দ্বারা

সম্ভব হয় না, বরং দক্ষ ব্যক্তিগণের সাহচর্য ও সংশ্রবের মাধ্যমেই তা সম্ভব হতে পারে। বাস্তবপক্ষে মানুষের শিক্ষক এবং অভিভাবক মানুষই হতে পারে। কেবল কিতাব বা পুস্তক শিক্ষক ও অভিভাবক হতে পারে না।

এ এমনই এক বাস্তব সত্য যে, দুনিয়ার যাবতীয় কাজকর্মেও এর নিদর্শন বিদ্যমান। শুধু পুঁথিগত বিদ্যার দ্বারা কেউ না পারে কাপড় সেলাই করতে, না পারে আহার করতে। শুধু ডাক্তারী পুঁথিপত্র পাঠ করে কেউ ডাক্তার হতে পারে না। ইঞ্জিনিয়ারিং বইপত্র পাঠ করে কেউ ইঞ্জিনিয়ারও হতে পারে না। অনুরূপভাবে শুধু কোরআন-হাদীস পাঠ করাই কোন মানুষের পরিপূর্ণ তা'লীম ও তরবিয়তের জন্য যথার্থ হতে পারে না। যে পর্যন্ত কোন বিজ্ঞ লোকের নিকট বাস্তবভাবে শিক্ষা গ্রহণ না করে, সে পর্যন্ত দ্বীনের তা'লীম অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কোরআন ও হাদীসের ব্যাপারে অনেকেই এ ভুল ধারণা পোষণ করে যে, কোরআনের অর্থ ও তফসীর পাঠ করে কোরআন ও হাদীস সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়। এটা সম্পূর্ণ প্রকৃতি বিরুদ্ধ ধারণা। কেননা, যদি কিতাব এ ব্যাপারে যথেষ্ট হতো তবে নবী ও রাসূল প্রেরণের প্রয়োজন হতো না। কিতাবের সাথে রাসূলকে শিক্ষকরূপে পাঠানো হয়েছে।

আর সরল পথ নির্ধারণের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক স্বীয় মকবুল বান্দাদের তালিকা প্রদানও এর প্রমাণ যে, শুধুমাত্র কিতাবের পাঠই পূর্ণ তা'লীম ও তরবিয়তের জন্য যথেষ্ট নয়; বরং কোন কোন বিজ্ঞ লোকের নিকট এর শিক্ষালাভ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

বোঝা গেল, মানুষের প্রকৃত মুক্তি এবং কল্যাণপ্রাপ্তির জন্য দু'টি উপাদানের প্রয়োজন। প্রথম, আল্লাহ্র কিতাব—যাতে মানবজীবনের সকল দিকের পথনির্দেশ রয়েছে এবং অপরটি হচ্ছে আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা বা আল্লাহ্-ওয়ালাগণ। তাঁদের কাছ থেকে ফায়দা হাসিল করার মাপকাঠি হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্র কিতাবের নিরিখে তাঁদেরকে পরীক্ষা করতে হবে। এ পরীক্ষায় যারা টিকবে না তারা আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র নয় বলেই যারা সঠিক অর্থে আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র স্থির হয়, তাঁদের নিকট আল্লাহ্র কিতাবের শিক্ষা লাভ করে তৎপ্রতি আমল করতে হবে।

মতানৈক্যের কারণ ঃ একশ্রেণীর লোক শুধু আল্লাহ্র কিতাবকে গ্রহণ করেছে এবং আল্লাহ্র প্রিয়পাত্রগণ থেকে দূরে সরে গিয়েছে ; তাঁদের তফসীর ও শিক্ষাকে কোন গুরুত্বই দেয়নি। আবার কিছু লোক আল্লাহ্র প্রিয়পাত্রগণকেই সত্যের মাপকাঠি স্থির করে আল্লাহ্র কিতাব থেকে দূরে সরে পড়েছে। বলা বাহুল্য, এ দুই পথের পরিণতিই গোমরাহী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরাতুল-ফাতিহাতে প্রথমে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও তা'রীফ রয়েছে। অতঃপর তাঁর এবাদতের উল্লেখ রয়েছে। এদতসঙ্গে এ কথারও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমরা তাঁকে ব্যতীত অন্য কাউকেও অভাব পূরণকারী মনে করি না। প্রকারান্তরে এটি আল্লাহ্র সাথে মানুষের একটা শপথ বিশেষ। অতঃপর রয়েছে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থনা, যাতে মানুষের সর্বপ্রকার প্রয়োজন এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এতে কতিপয় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় এবং গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলাও সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রাসঙ্গিক কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ

দোয়া করার পদ্ধতি ঃ এ সূরায় একটা বিশেষ ধরনের বর্ণনারীতির মাধ্যমে মানুষকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, যখন আল্লাহ্র নিকট কোন দোয়া বা কোন আকুতি পেশ করতে হয়, তখন প্রথমে তাঁর তা'রীফ কর, তাঁর দেয়া সীমাহীন নেয়ামতের স্বীকৃতি দাও। অতঃপর একমাত্র তিনি ছাড়া অন্য কাউকেও দাতা ও অভাব পূরণকারী মনে করো না কিংবা অন্য কাউকেই এবাদতের যোগ্য বলে স্বীকার করো না। অতঃপর স্বীয় উদ্দেশ্যের জন্য আরজী পেশ কর। এ নিয়মে যে দোয়া করা হয়, তা কবুল হওয়ার ব্যাপারে বিশেষ আশা করা যায়। দোয়া করতেও এমন ব্যাপক পদ্ধতি অবলম্বন কর, যাতে মানুষের সকল মকসুদ তার অন্তর্ভুক্ত থাকে। যথা, সরল পথ লাভ করা এবং দুনিয়ার যাবতীয় কাজে সরল-সঠিক পথ পাওয়া, যাতে কোথাও কোন ক্ষতি বা পদস্খলনের আশংকা না থাকে। মোটকথা, এস্থলে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে তাঁর তা'রীফ প্রশংসা করার প্রকৃত উদ্দেশ্যই হল মানবকুলকে শিক্ষা দেওয়া।

আল্লাহ্র তা'রীফ বা প্রশংসা করা মানুষের মৌলিক দায়িত্ব ঃ এ সূরার প্রথম বাক্যে আল্লাহ্র তা'রীফ বা প্রশংসা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। তা'রীফ বা প্রশংসা সাধারণত কোন গুণের বা প্রতিদানের পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখ হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে কোন গুণের বা প্রতিদানের উল্লেখ নেই।

এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র নেয়ামত অগণিত। কোন মানুষ এর পরিমাপ করতে পারে না। কোরআনে এরশাদ হয়েছে ঃ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا অর্থাৎ, যদি তোমরা আল্লাহ্র নেয়ামতের গণনা করতে চাও, তবে তা পারবে না। মানুষ যদি সারা বিশ্ব হতে মুখ ফিরিয়ে শুধুমাত্র নিজের অস্তিত্বের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, তবে বুঝতে পারবে যে, তার শরীরই এমন একটি ক্ষুদ্র জগত, যাতে বৃহৎ জগতের সকল নিদর্শন বিদ্যমান। তার শরীর যমীন তুল্য। কেশরাজি উদ্ভিদ-

তুল্য। তার হাড়গুলো পাহাড়ের মত এবং শিরা-উপশিরা যাতে রক্ত চলাচল করে, সেগুলো নদী-নালা বা সমুদ্রের নমুনা। দু'টি বস্তুর সংমিশ্রণে মানুষের অস্তিত্ব। একটি শরীর ও অপরটি আত্মা। এ কথাও স্বীকৃত যে, মানবদেহে আত্মা সর্বাপেক্ষা উত্তম অংশ আর তার শরীর হচ্ছে আত্মার অনুগত এবং অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট মানের অধিকারী। এ নিকৃষ্ট অংশের পরীক্ষা-নিরীক্ষাকারী চিকিৎসকগণ বলেছেন যে, মানবদেহে আল্লাহ্ তা'আলা পাঁচ হাজার প্রকার উপাদান রেখেছেন। এতে তিন শতেরও অধিক জোড়া রয়েছে। প্রত্যেকটি জোড়া আল্লাহ্র কুদরতে এমন সুন্দর ও মজবুতভাবে দেওয়া হয়েছে যে, সর্বদা নড়াচড়া করা সত্ত্বেও তার মধ্যে কোন পরিবর্তন হয় না এবং কোন প্রকার মেরামতেরও প্রয়োজন হয় না। সাধারণত মানুষের বয়স ষাট-সত্তর বছর হয়ে থাকে। এ দীর্ঘ সময় তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো সর্বদা নড়াচড়া করছে, অথচ এর মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন- نَحْنُ خَلَقْنٰهُمْ وَشَدَدْنَا اَسْرَهُمْ অর্থাৎ, "আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং আমিই তাদের জোড়াগুলোকে মজবুত করেছি।" এ কুদরতী মজবুতির পরিণাম হয়েছে এই যে, সাধারণভাবে উহা অত্যন্ত নরম ও নড়বড়ে অথচ এ নড়বড়ে জোড়া সত্তুর বছর বা এর চাইতেও অধিক সময় পর্যন্ত কর্মরত থাকে। মানুষের অঙ্গগুলোর মধ্যে শুধু চক্ষুর কথাই ধরুন, এতে আল্লাহ্ তা'আলার অসাধারণ হেকমত প্রকাশিত হয়েছে, সারাজীবন সাধনা করেও এ রহস্য-টুকু উদ্ধার করা সম্ভব নয়।

এ চোখের এক পলকের কার্যক্রম লক্ষ্য করলে বুঝতে পারা যাবে যে, এর এক মিনিটের কার্যক্রমে আল্লাহ্ তা'আলার কত নেয়ামত যে কাজ করছে, তা ভেবে অবাক হতে হয়। কেননা চক্ষু খুলে এ দ্বারা কত বস্তুকে সে দেখছে। এতে যেভাবে চক্ষুর ভিতরের শক্তি কাজ করছে, অনুরূপভাবে বহির্জগতের সৃষ্টিরাজিও এতে বিশেষ অংশ নিচ্ছে। সূর্যের কিরণ না থাকলে চোখের দৃষ্টিশক্তি কোন কাজ করতে পারে না। সূর্যের জন্য আকাশের প্রয়োজন হয়। মানুষের দেখার জন্য এবং চক্ষু দ্বারা কাজ করার জন্য আহার্য ও বায়ুর প্রয়োজন হয়। এতে বোঝা যায়, চোখের এক পলকের দৃষ্টির জন্য বিশ্বের সকল শক্তি ব্যবহৃত হয়। এ তো একবারের দৃষ্টি। এখন দিনে কতবার দেখে এবং জীবনে কতবার দেখে তা হিসাব করা মানুষের শক্তির উর্ধ্বে। এমনিভাবে কান, জিহবা, হাত ও পায়ের যত কাজ আছে তাতে সমগ্র জগতের শক্তি যুক্ত হয়ে কার্য সমাধা হয়। এ তো সে মহা দান যা প্রতিটি জীবিত মানুষ ভোগ করে। এতে রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্রের কোন পার্থক্য নেই। তাছাড়া আল্লাহ্ তা'আলার অসংখ্য নেয়ামত এমন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে রাখা হয়েছে যা প্রতিটি প্রাণী ভোগ করেও উপকৃত হয়। আকাশ-যমীন এবং এ দু'টির মধ্যে সৃষ্ট সকল বস্তু যথা চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, বায়ু প্রভৃতি প্রতিটি প্রাণীই উপভোগ করে।

এরপর আল্লাহ্‌র বিশেষ দান, যা মানুষকে হেকমতের তাকিদে কম-বেশী দেওয়া হয়েছে, ধন-সম্পদ, মান-সম্মান, আরাম-আয়েশ সবই এর অন্তর্ভুক্ত। যদিও একথা অত্যন্ত মৌলিক যে, সাধারণ নেয়ামত যা সকল স্তরের মানুষের মধ্যে সমভাবে উপ-ভোগ্য ; যথা—আকাশ, বাতাস, জমি এবং বিরাট এ প্রকৃতি, এ সমস্ত নেয়ামত বিশেষ নেয়ামতের (যথা ধন-সম্পদ) তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও উত্তম। অথচ এসব নেয়ামত সকল মানুষের মধ্যে সমভাবে পরিব্যাপ্ত বলে, এত বড় নেয়ামতের প্রতি মানুষ দৃষ্টিপাত করে না। ভাবে, কি নেয়ামত! বরং আশপাশের সামান্য বস্তু যথা, আহার্য, পানীয়, বসবাসের নির্ধারিত স্থান, বাড়ী-ঘর প্রভৃতির প্রতিই তাদের দৃষ্টি সাধারণত সীমাবদ্ধ থাকে।

মোটকথা, সৃষ্টিকর্তা মানবজাতির জীবন-ধারণ এবং দুনিয়ার জীবনে বেঁচে থাকার সুবিধার্থে যে অফুরন্ত নেয়ামত দান করেছেন, তার অতি অল্পই এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের পক্ষে দুনিয়ার জীবনে চোখ মেলেই মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই মহান দাতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকা ছিল স্বাভাবিক। বলা বাহুল্য যে, মানব-জীবনের সে চাহিদার প্রেক্ষিতে কোরআনের সর্বপ্রথম সূরার সর্বপ্রথম বাক্যে الحمد ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেই মহান সত্তার তা'রীফ বা প্রশংসাকে এবাদতের শীর্ষ-স্থানে রাখা হয়েছে।

রাসূল (সা) এরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কোন নেয়ামত কোন বান্দাকে দান করার পর যখন সে الحمد لله বলে তখন বুঝতে হবে, যা সে পেয়েছে, এই শব্দ তার চেয়ে অনেক উত্তম। (কুরতুবী)

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি যদি বিশ্ব-চরাচরের সকল নেয়ামত লাভ করে এবং সেজন্য সে আলহামদুলিল্লাহ্ বলে তবে বুঝতে হবে যে, সারা বিশ্বের নেয়ামতসমূহ অপেক্ষা তার الحمد বলা অতি উত্তম। (কুরতুবী)

কোন কোন আলেমের মন্তব্য উদ্ধৃত করে কুরতুবী লিখেছেন যে, মুখে الحمد لله বলা একটি নেয়ামত এবং এ নেয়ামত সারা বিশ্বের সকল নেয়ামত অপেক্ষা উত্তম। সহীহ্ হাদীসে আছে যে, الحمد لله পরকালের তৌলদণ্ডের অর্ধেক পরিপূর্ণ করবে।

হযরত শকীক ইবনে ইবরাহীম الحمد-এর ফযীলত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কোন নেয়ামত দান করেন, তখন প্রথমে দাতাকে চেন এবং পরে তিনি যা দান করেছেন তাতে সন্তুষ্ট থাক। আর তাঁর দেয়া শক্তি ও ক্ষমতা তোমাদের শরীরে যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর অবাধ্যতার কাছেও যেও না।

দ্বিতীয় শব্দ 'اللّٰه' এর সাথে 'الم' বর্ণটি যুক্ত। যাকে আরবী ভাষার নিয়ম অনুযায়ী খাস 'الم' বলা হয়। যা কোন আদেশ বা গুণের বিশেষত্ব বোঝায়। এখানে অর্থ হচ্ছে যে, শুধু তা'রীফ বা প্রশংসাই মানবের কর্তব্য নয়। বরং এ তারীফ বা প্রশংসা তাঁর অস্তিত্বের সাথে সংযুক্ত। বাস্তবিক পক্ষে তিনি ব্যতীত এ জগতে অন্য কেউ তা'রীফ বা প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য নয়। এর বিস্তারিত বর্ণনা পূর্বে করা হয়েছে। এতদসঙ্গে এও তাঁর নেয়ামত যে, মানুষকে চরিত্র গঠন শিক্ষাদানের জন্য এ আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, আমার নেয়ামতসমূহ যে সকল মাধ্যম অতিক্রম করে আসে, সেগুলোরও শুকরিয়া আদায় করতে হবে। আর যে ব্যক্তি এহ্সানকারীর শোকর আদায় করে না, সে বাস্তবপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলারও শোকর করে না।

কোন মানুষের জন্যই নিজের প্রশংসা জায়েয নয়ঃ কোন মানুষের জন্য নিজের তারীফ বা প্রশংসা করা জায়েয নয়। কোরআনে এরশাদ হয়েছেঃ فَلَا تُزَكُّوٓا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى অর্থাৎ তোমরা আত্ম-প্রশংসা বা পবিত্রতার দাবী করো না, আল্লাহ্ই ভাল জানেন, কে মুত্তাকী। কেননা, মানুষের পক্ষে তা'রীফ বা প্রশংসার যোগ্য হওয়া তার তাকওয়া-পরহেযগারীর উপর নির্ভরশীল। কার পরহেযগারী কোন্ স্তরের তা আল্লাহ্ই ভাল জানেন। প্রশ্ন ওঠে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তো তাঁর প্রশংসা নিজেই করেছেন। উত্তর হচ্ছে এই, আল্লাহ্র প্রশংসা বা তা'রীফ কিভাবে করতে হবে সে পদ্ধতি উদ্ভাবন করার যোগ্যতা মানুষের নেই। পরন্তু আল্লাহ্ তা'আলার উপযোগী তা'রীফ বা প্রশংসা করাও মানুষের ক্ষমতার উর্ধ্বে। রাসূল (সা) এরশাদ করেছেনঃ لا احصى ثناء عليك আমি আপনার উপযোগী তা'রীফ বা প্রশংসা করতে পারি না। এ জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর তা'রীফ বা প্রশংসার পদ্ধতি মানুষকে নিজের তরফ থেকে শিক্ষা দিয়েছেন।

'রব' আল্লাহ্র এক বিশেষ নাম, অন্য কাউকে এ নামে সম্বোধন জায়েয নয়ঃ কোন বস্তুর মালিক, পালনকর্তা এবং সর্ববিষয়ে সে বস্তুর পূর্ণতা বিধানের একচ্ছত্র অধিকারী কোন সত্তার প্রতিই কেবল 'রব' শব্দ প্রয়োগ করা যেতে পারে। আর এ কথা সর্বজনবিদিত যে, সমগ্র সৃষ্টিজগতের এরূপ মালিক ও পালনকর্তা একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ছাড়া অন্য কেউ হতে পারে না। এ কারণেই এ শব্দ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার নামের সাথেই ব্যবহৃত হতে পারে এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে 'রব' বলা জায়েয নয়। সহীহ্ মুসলিম শরীফের হাদীসে এ ব্যাপারে নিষেধবাণী উচ্চারণ করে বলা হয়েছে যে, কোন গোলাম বা কর্মচারী যেন তার মালিককে 'রব' শব্দ দ্বারা সম্বোধন না করে। অবশ্য

বিশেষ কোন বস্তুর মালিকানা বোঝানোর অর্থে এ শব্দের প্রয়োগ চলতে পারে। যথা, রাব্বুল-বাইত,—বাড়ীর মালিক ইত্যাদি। (কুরতুবী)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ —এর অর্থ মুফাসসিরকুল-শিরোমণি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, আমরা তোমারই এবাদত করি, তুমি ব্যতীত অন্য কারো এবাদত করি না। আর তোমারই সাহায্য চাই, তুমি ব্যতীত অন্য কারো সাহায্য চাই না। (ইবনে জরীর, ইবনে আবি হাতেম)

সলফে-সালেহীনদের কেউ কেউ বলেছেন যে, সূরা আল-ফাতিহা সমগ্র কোরআনের সারমর্ম এবং إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ সমগ্র সূরা আল-ফাতিহার সারমর্ম। কেননা, এর প্রথম বাক্যে রয়েছে শিরক থেকে মুক্তির ঘোষণা এবং দ্বিতীয় বাক্যে তার পরিপূর্ণ শক্তি ও কুদরতের স্বীকৃতি। মানুষ দুর্বল, আল্লাহ্র সাহায্য ব্যতীত কোন কিছুই সে করতে পারে না। তাই সকল ব্যাপারে আল্লাহ্র উপর একান্তভাবে নির্ভর করা ব্যতীত তার গত্যন্তর নেই। এ উপদেশ কোরআনের স্থানে স্থানে দেওয়া হয়েছে। যথা :

—فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ (هود)

—قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا (ملك)

—رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا (مزمل)

এ আয়াতগুলোর সারমর্ম হচ্ছে যে, মু'মিন স্বীয় আমল বা নিজের যোগ্যতার উপর নির্ভর করে না, আবার অন্য কারো সাহায্যের উপরও নয়। বরং একমাত্র আল্লাহ্র সাহায্যের উপরই তাকে পূর্ণ ভরসা করতে হবে। এতে আকায়েদের দু'টি মাস'আলারও মীমাংসা হয়ে গেছে। যথা :

এক. আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো এবাদত জায়েয নয়। তাঁর এবাদতে অন্য কাউকে অংশীদার করা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ : ইতিপূর্বে এবাদতের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, কোন সত্তার অসীমতা, মহত্ত্ব এবং তাঁর প্রতি ভালবাসার ভিত্তিতে, তাঁর সামনে অশেষ কাকুতি-মিনতি পেশ করার নামই এবাদত। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো সাথে অনুরূপ আচরণ করাই শিরক। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, মূর্তিপূজার মত প্রতীকপূজা বা পাথরের মূর্তিকে খোদায়ী শক্তির আধার মনে করা

বা কারো প্রতি সম্ভ্রম বা ভালবাসা এ পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়া, যা আল্লাহ্‌র জন্য করা হয়, তাও শিরকের অন্তর্ভুক্ত। কোরআনে ইহুদী ও নাসারাদের অনুসৃত শিরকের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ -

অর্থাৎ, তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তাদের সাধু-সন্ন্যাসীদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে। আদী ইবনে হাতেম খৃস্টধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হবার পর এ আয়াত সম্বন্ধে রাসূল (সা)-কে প্রশ্ন করেছিলেন যে, আমরা তো আমাদের পুরোহিতদের এবাদত করিনি, কোরআন আমাদের প্রতি কি ভাবে এ অপবাদ দিয়েছে? প্রত্যুত্তরে রাসূল (সা) এরশাদ করেছিলেন ঃ "পুরোহিত আলেমগণ এমন অনেক বস্তুকে কি হারাম বলেনি, যেগুলোকে আল্লাহ্‌ হালাল করেছেন এবং এমন অনেক বস্তুকে হালাল বলেনি, যেগুলোকে আল্লাহ্‌ হারাম বলেছেন? আ'দী ইবনে হাতেম স্বীকার করেছিলেন যে, তা অবশ্য করেছেন। তখন রাসূল (সা) বলেছিলেন যে, এ তো প্রকারান্তরে তাদের এবাদতই হলো।"

এতে বোঝা যাচ্ছে যে, কোন বস্তুকে হালাল বা হারাম ঘোষণা করা একমাত্র আল্লাহ্‌রই কাজ। যে ব্যক্তি এ কাজে অন্যকে অংশীদার করে, হালাল ও হারাম জানা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো কথাকে অবশ্যকরণীয় মনে করে, তবে প্রকারান্তরে সে তার এবাদতই করে এবং শিরকে পতিত হয়। সাধারণ মুসলমান যারা কোরআন-হাদীস সরাসরি বুঝতে পারে না, শরীয়তের হুকুম-আহ্‌কাম নির্ধারণের যোগ্যতা রাখে না; এজন্য কোন ইমাম, মুজতাহিদ, আলেম বা মুফতীর কথার উপর বিশ্বাস রেখে কাজ করে; তাদের সাথে এ আয়াতের মর্মের কোন সম্পর্ক নেই; কেননা, প্রকৃতপক্ষে তারা কোরআন ও সুন্নাহ্‌ মোতাবেক আমল করে; আল্লাহ্‌র নিয়ম-বিধানেরই অনুকরণ করে। আলেমগণের নিকট থেকে তারা আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ্‌র ব্যাখ্যা গ্রহণ করে মাত্র। কোরআনই তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছে ঃ فَاسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ - অর্থাৎ, "যদি আল্লাহ্‌র আদেশ তোমাদের জানা না থাকে, তবে আলেমদের নিকট জেনে নাও।"

হালাল-হারাম নির্ধারণের ব্যাপারে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য যে কাউকেই অংশীদার করা শিরক। অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো নামে মানত করাও শিরক। প্রয়োজন মেটানো বা বিপদ মুক্তির জন্য আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো কাছে দোয়া করাও শিরক। কেননা, হাদীসে দোয়াকে এবাদতরূপে গণ্য করা হয়েছে। কাজেই যে সকল কার্যকলাপে শিরকের নিদর্শন রয়েছে, সেসব কাজ করাও শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

হযরত আদী ইবনে হাতেম বলেন—ইসলাম কবুল করার পর আমি আমার গলায় ক্রুস পরিহিত অবস্থায় রাসূল (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়েছিলাম। এটা দেখে হুযুর আদেশ করলেন, এ মূর্তিটা গলা হতে ফেলে দাও। আদী ইবনে হাতেম যদিও ক্রুস সম্পর্কে তখন নাসারাদের ধারণা পোষণ করতেন না, এতদসত্ত্বেও প্রকাশ্যভাবে শিরকের নিদর্শন থেকে বেঁচে থাকা অত্যাবশ্যকীয় বলে রাসূল (সা) তাঁকে এ নির্দেশ দিয়েছিলেন।

আফসোসের বিষয়! আজকাল হাজার হাজার মুসলমান খৃস্টানদের ধর্মীয় নিদর্শন ক্রুস-এর বিকল্প নেকটাই সগৌরবে গলায় লাগিয়ে প্রকাশ্য শিরকীতে লিপ্ত হচ্ছে। এমনিভাবে কারো প্রতি রুকু বা সেজদা করা, বায়তুল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর তওয়াফ করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এসব থেকে বেঁচে থাকার স্বীকারোক্তি এবং আনুগত্যের অঙ্গীকারই إِيَّاكَ نَعْبُدُ -তে করা হয়েছে।

দ্বিতীয় মাস'আলা : কারো সাহায্য চাওয়ার বিষয়টি কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা সাপেক্ষ। কেননা, বৈষয়িক সাহায্য তো একজন অপরজনের কাছ থেকে সব সময়ই নিয়ে থাকে। এ ছাড়া দুনিয়ার কাজ-কারবার চলতেই পারে না। যথা—প্রস্তুতকারক, দিন-মজুর, নির্মাতা, কর্মকার, কুম্ভকার প্রভৃতি সকল শ্রেণীর কারিগরই অন্যের সাহায্যে নিয়োজিত, অন্যের খেদমতে সর্বদা ব্যস্ত এবং প্রত্যেকেই তাদের সাহায্যপ্রার্থী ও সাহায্য গ্রহণে বাধ্য। এরূপ সাহায্য নেওয়া কোন ধর্মমতেই বা কোন শরীয়তেই নিষেধ নয়। কারণ, এ সাহায্যের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থিত সাহায্য কোন অবস্থাতেই সম্পৃক্ত নয়, অনুরূপভাবে কোন নবী বা ওলীর বরাত দিয়েও আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য প্রার্থনা করা কোরআনের নির্দেশ ও হাদীসের বর্ণনায় বৈধ প্রমাণিত হয়েছে। এরূপ সাহায্য প্রার্থনাও আল্লাহ্র সম্পর্কযুক্ত সাহায্য প্রার্থনার অন্তর্ভুক্ত নয়, যা কোরআন ও হাদীসে শিরকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আল্লাহ্র নিকট বিশেষভাবে প্রার্থিত সাহায্য দু'প্রকার। এক—আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ফেরেশতা, কোন নবী, কোন ওলী বা কোন মানুষকে একক ক্ষমতাশালী বা একক ইচ্ছাশক্তির অধিকারী মনে করে তাদের নিকট কিছু চাওয়া—ইহা প্রকাশ্য কুফরী। একে কাফের-মুশরিকরাও কুফরী বলে মনে করে। তারা নিজেদের দেবীদেরকেও আল্লাহ্র ন্যায় সর্বশক্তিমান একক ইচ্ছাশক্তির অধিকারী মনে করে না।

দুই—সাহায্য প্রার্থনার যে পন্থা কাফেরগণ গ্রহণ করে থাকে, কোরআন তাকে বাতিল ও শিরক বলে ঘোষণা করেছে। তা হচ্ছে কোন ফেরেশতা, নবী, ওলী বা দেবদেবী সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করা যে, প্রকৃত শক্তি ও ইচ্ছার মালিক তো আল্লাহ্ তা'আলাই, তবে তিনি তাঁর কুদরতে সে ক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তির কিছু অংশ অমুককে দিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে তাকে ক্ষমতা দান করেছেন এবং সে ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীন। কোরআনের إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, এরূপ সাহায্য আমরা আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো নিকট চাইতে পারি না।

সাহায্য-সহায়তা সম্পর্কিত এ ধারণা মু'মিন ও কাফের এবং ইসলাম ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে। কোরআন একে হারাম ও শিরক ঘোষণা করেছে এবং কাফেরগণ একে সমর্থন করে এ অনুযায়ী আমল করছে। এ ব্যাপারে যেখানে সংশয়ের উদ্ভব হয় তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তাঁর কোন কোন ফেরেশতার উপর পার্থিব ব্যবস্থা পরিচালনার অনেক দায়িত্ব অর্পণ করেছেন বলে বর্ণনা রয়েছে। এরূপ ধারণা সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নয় যে, ফেরেশতাগণকে স্ব-স্ব-দায়িত্ব পালনে আল্লাহ্ নিজেই তা ক্ষমতা দিয়েছেন, তদনুরূপ নবীগণকেও এমন কিছু কাজ করার ক্ষমতা দিয়েছেন যা অন্য মানুষের ক্ষমতার ঊর্ধ্বে ; যথা, মু'জেযা। অনুরূপ আওলিয়াগণকেও এমন কিছু কাজের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যা সাধারণ মানুষ করতে পারে না। যেমন, কারামত। সুতরাং স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে এরূপ ধারণায় পতিত হওয়া বিচিত্র নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় ক্ষমতার কিয়দংশ যদি তাদের মধ্যে না-ই দিতেন, তবে তাঁদের দ্বারা এমন সব কাজ কি করে হয়ে থাকে? এতে নবী ও ওলীগণের প্রতি কর্মে স্বাধীন হওয়ার বিশ্বাস জন্মে। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। বরং মু'জেযা এবং কারামত একমাত্র আল্লাহ্রই কাজ। এর প্রকাশ নবী ও ওলীগণের মাধ্যমে করে থাকেন শুধু তাঁর হেকমত ও রহস্য বোঝাবার জন্য। নবী ও ওলীগণের পক্ষে সরাসরি এসব কাজ করার ক্ষমতা নেই। এ সম্পর্কে অসংখ্য আয়াত রয়েছে। যথা,—এরশাদ হয়েছে ঃ

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ -

বদরের যুদ্ধে রাসূল (সা) শত্রুসৈন্যদের প্রতি একমুষ্টি কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিলেন এবং সে কঙ্কর সকল শত্রুসৈন্যের চোখে গিয়ে পড়েছিল। সে মু'জেযা সম্পর্কে এ আয়াতে বলা হয়েছে যে,—"হে মুহাম্মদ (সা)! এ কঙ্কর আপনি নিক্ষেপ করেন নি, বরং আল্লাহ্

১২—

তা'আলাই নিক্ষেপ করেছেন।" এতে বোঝা যায় যে, নবীগণের মাধ্যমে মু'জেযারূপে যেসব অস্বাভাবিক কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সেগুলো ছিল আল্লাহ্‌রই কাজ। অনুরূপ, হযরত নূহ (আ)-কে তাঁর জাতি বলেছিল যে, আপনি যদি সত্য নবী হয়ে থাকেন, তবে যে শাস্তি সম্পর্কে আমাদের ভীতি প্রদর্শন করছেন, তা এনে দেখান। তখন তিনি বলেছিলেন ঃ اِنَّمَا يَأْتِيْكُمْ بِهِ اللّٰهُ মু'জেযারূপে আসমানী বালা নিয়ে আসা আমার ক্ষমতার ঊর্ধ্বে। যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তবে আসবে, তখন তোমরা তা থেকে পালাতে পারবে না।

সূরা ইবরাহীমে নবী ও রাসূলগণের এক দলের কথা উল্লেখিত হয়েছে। তাঁরা বলেছেন ঃ

مَا كَانَ لَنَا اَنْ نَّاْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۝

অর্থাৎ, "কোন মু'জেযা দেখানো আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই হতে পারে না।" তাই কোন নবী বা ওলী কোন মু'জেযা বা কারামত যখন ইচ্ছা বা যা ইচ্ছা দেখাবেন, এমন ক্ষমতা তাদের কাউকেই দেওয়া হয়নি।

রাসূল ও নবীগণকে মুশরিকরা কত রকমের মু'জেযা দেখাতে বলেছে, কিন্তু যেগুলোতে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হয়েছে সেগুলোই প্রকাশ পেয়েছে। আর যেগুলোতে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হয়নি, সেগুলো প্রকাশ পায়নি। কোরআনের সর্বত্র এ সম্পর্কিত তথ্য বিদ্যমান।

একটি স্থূল উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি উপলব্ধি করা সহজ হবে। যেমন, ঘরে বসে আমরা যে বাল্বের আলো ও বৈদ্যুতিক পাখার বাতাস পাই, সে বাল্ব ও পাখা এই আলো ও হাওয়া প্রদানের ব্যাপারে নিজস্বভাবে কখনও ক্ষমতার অধিকারী নয়। প্রকৃতপক্ষে তার সংযোগের মাধ্যমে বিদ্যুৎ-কেন্দ্রের সাথে এগুলোর যে সম্পর্ক স্থাপিত, আলো এবং বাতাস প্রদান একান্তভাবে সে সংযোগের উপরই নির্ভরশীল। এক মুহূর্তের জন্যও যদি এ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয় তবে না বাল্ব আপনাকে আলো দিতে পারবে, না পাখা বাতাস দিতে সক্ষম হবে। কেননা. এ আলো বাল্বের নয়; বরং বিদ্যুতের, যা বিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্র হতে বাল্ব ও পাখার মধ্যে পৌঁছে থাকে। নবী, রাসূল, আওলিয়া ও ফেরেশতাগণ প্রত্যেকেই প্রতিটি কাজের জন্য প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ্ তা'আলার মুখাপেক্ষী। তাঁর ইচ্ছায়ই বাল্ব ও পাখার মধ্যে

বিদ্যুৎ সঞ্চালনের ন্যায় নবী ও আওলিয়াগণের মাধ্যমে মু'জেযা ও কারামতরূপে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়।

এ উদাহরণে এ কথাও বোঝা গেল যে, মু'জেযা ও কারামত প্রতিফলনে নবী-রাসূল ও ওলীগণের কোন একচ্ছত্র ক্ষমতা নেই। তবে তাঁরা যে একেবারেই ক্ষমতাহীন তাও নয়। যেমনিভাবে বাল্‌ব ও পাখা ব্যতীত আলো ও বাতাস পাওয়া অসম্ভব, তেমনিভাবে মু'জেযা ও কারামত প্রকাশের ব্যাপারে নবী ও ওলীগণের মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে, সমস্ত ফিটিং সংযোজন ঠিক হওয়া সত্ত্বেও বাল্‌ব এবং পাখা ব্যতীত আলো-বাতাস পাওয়া অসম্ভব, কিন্তু মু'জেযা ও কারামতের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা সব কিছুই করতে পারেন। তবে সাধারণত তিনি নবী-রাসূল ও ওলীগণের মাধ্যম ব্যতীত তা করেন না। কারণ, তাতে এগুলোর প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না।

তাই এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, সব কিছুই একমাত্র আল্লাহ্ তা'আল'র ইচ্ছাতেই হয়ে থাকে এবং এতদসঙ্গে নবী-রাসূল ও ওলী-আওলিয়াগণের গুরুত্বের বিশেষভাবে স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে। এ বিশ্বাস এবং স্বীকৃতি ব্যতীত আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং তাঁর বিধানের অনুসরণ থেকে বঞ্চিত হতে হবে। যেভাবে কোন ব্যক্তি বাল্‌ব ও পাখার গুরুত্ব অনুধাবন না করে একে নষ্ট করে দিয়ে আলো-বাতাস পাওয়ার আশা করতে পারে না, তেমনি নবী-রাসূল ও ওলী-আওলিয়াগণের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি ব্যতীত আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি আশা করা যায় না।

সাহায্য প্রার্থনা ও ওসীলা তালাশ করা এবং তা গ্রহণ করার প্রশ্নে নানা প্রকার প্রশ্ন ও সংশয়ের উৎপত্তি হতে দেখা যায়। আশা করা যায় যে, উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা সে সংশয় ও সন্দেহের নিরসন হবে।

নবী-রাসূল এবং ওলীগণকে ওসীলা বানানো সম্পূর্ণ জায়েয বা একেবারেই না-জায়েয বলা সঙ্গত নয়। বরং উপরের আলোচনার ভিত্তিতে এতটুকু বলা যায় যে, যদি কেউ তাঁদেরকে বাস্তব ক্ষমতাবান, স্বীয় শক্তিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং হাজত পূরণের অধিকারী মনে করে, তবে তা হারাম এবং শিরক হবে। কিন্তু যদি তাঁদেরকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি আহরণের মাধ্যম জ্ঞান করে তাঁদের ওসীলা গ্রহণ করা হয়, তবে এটা সম্পূর্ণ বৈধ হবে। কিন্তু এ প্রশ্নে সাধারণত বাড়াবাড়ি করতে দেখা যায়।

সিরাতে-মুস্তাকীমের হেদায়েতই দ্বীন-দুনিয়ার সাফল্যের চাবিকাঠি ঃ আলোচ্য তফসীরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যে দোয়াকে সর্বক্ষণ সকল লোকের সকল কাজের জন্য নির্ধারণ করেছেন তা হচ্ছে সিরাতুল-মুস্তাকীমের হেদায়েতপ্রাপ্তির দোয়া। এমনিভাবে আখেরাতের মুক্তি যেমন সে সরল

পথে রয়েছে যা মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাবে, অনুরূপভাবে দুনিয়ার যাবতীয় কাজের উন্নতি-অগ্রগতিও সিরাতুল-মুস্তাকীম বা সরল পথের মধ্যে নিহিত। যে সমস্ত পন্থা অবলম্বন করলে উদ্দেশ্য সফল হয়, তাতে পূর্ণ সফলতাও অনিবার্যভাবেই হয়ে থাকে।

وَاللّٰهُ اَسْأَلُ الصَّوَابَ وَالسَّدَادَ وَبِيَدِهٖ الْمَبْدَاءُ وَالْمَعَادُ -

যে সব কাজে মানুষ সফলতা লাভ করতে পারে না, তাতে গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, সে কাজের ব্যবস্থাপনা ও পদ্ধতিতে নিশ্চয়ই কোন ভুল হয়েছে।

সারকথা, সরল পথের হেদায়েত কেবল পরকাল বা দ্বীনী জীবনের সাফল্যের জন্যই নির্দিষ্ট নয়, বরং দুনিয়ার সকল কাজের সফলতাও এরই উপর নির্ভরশীল। এজন্যই প্রত্যেক মু'মিনের এ দোয়া তসবীহস্বরূপ সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য। তবে মনোযোগ সহকারে স্মরণ রাখতে ও দোয়া করতে হবে; শুধু শব্দের উচ্চারণ যথেষ্ট নয়।

وَاللّٰهُ الْمُوَفِّقُ وَالْمُعِيْنُ -